১

চয়নিকা

গ্রন্থনিলয়

ক্ষেত্র গুপ্ত

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of Bengali for Class VI vide Notification No. TB/74/VI/TB/110 and also Board's Letter No. 10367/G dated 24.11.75.

চয়নিকা

[প্রথম ভাগ]

(ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, এম. এ. (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), পিএইচ. ডি., ডি. লিট্,
রীডার, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।

গ্রন্থনিলয়
৫৩/১/ বি, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫
পঞ্চম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৮
ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০
সপ্তম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৮১

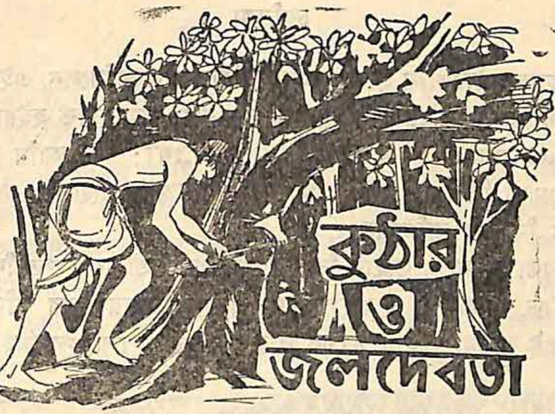
মূল্য ঃ দুই টাকা ষাট পয়সা

মুদ্রাকর ঃ
ইম্পেক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১০৩/১বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বিষয়-সূচী

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক-পরিচয়। বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বাংলা গদ্যকে মার্জিত ও ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলেন। তাঁহার "বেতাল পঞ্চবিংশতি", "শকুন্তলা" প্রভৃতি নামকরা বই। গত যুগের তিনি একজন প্রধান মানুষ ছিলেন। এদেশের সমাজ সংস্কার করিবার জন্য, কুপ্রথা দূর করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শিক্ষাবিস্তারেও তাঁহার খুব বড় ভূমিকা ছিল।

[**রচনা-পরিচয়।** একজন সত্যবাদী দুঃখী ব্যক্তি দেবতার নিকট হইতে পুরস্কার পাইল; মিথ্যাবাদী লোভী ব্যক্তির শুধু ক্ষতিই হইল। এই গল্পটি হইতে সত্যবাদী ও নির্লোভ হইবার শিক্ষা পাওয়া যায়।]

এক দুঃখী নদীর তীরে গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ কুঠারখানি তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া গিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠারখানি জন্মের মত হারাইলাম, এই ভাবিয়া সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং হায় কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া সেই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অতিশয় দয়া হইল। তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য এত রোদন করিতেছ? সে সমুদয় নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাৎ নদীতে মগ্ন হইলেন, এবং এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে কহিল, না মহাশয়! এ আমার কুঠার নয়। তিনি পুনরায় জলে মগ্ন হইলেন এবং এক রজতময় কুঠার হস্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে কহিল, না মহাশয় ইহাও আমার কুঠার নয়। তিনি পুনরায় জলে মগ্ন হইলেন, এবং

তাহার লৌহময় কুঠারখানি হস্তে লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুঠার? সে আপন কুঠার দেখিয়া, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইয়া কহিল, হাঁ মহাশয়! এই আমার কুঠার। আমি অতি দুঃখী; আর আমি কুঠার পাইব আমার সে আশা ছিল না; কেবল আপনকার অনুগ্রহে পাইলাম, আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন।

জলদেবতা প্রথমতঃ, তাহার নিজের কুঠারখানি তাহার হস্তে দিলেন; পরে, তুমি নির্লোভ, সত্যনিষ্ঠ, ও ধর্মপরায়ণ; এজন্য তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই বলিয়া তাহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ, সেই স্বর্ণময় ও রজতময়



কুঠার দুইখানি তাহাকে দিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই দুঃখী ব্যক্তি অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; অনন্তর গৃহে গিয়া প্রতিবেশীদের নিকট এই বৃত্তান্তের সবিশেষ বর্ণনা করিল। সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়া এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জন্মিল। সে পরদিন প্রাতঃকালে কুঠার হস্তে লইয়া নদীর তীরে উপস্থিত হইল এবং গাছের গোড়ায় দুই তিন কোপ মারিয়া, যেন হঠাৎ হাত হইতে ফস্কিয়া গেল, এইরূপ ভান করিয়া, কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিল এবং হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে সমস্ত কহিয়া, অতিশয় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

জলদেবতা পূর্ববৎ জলে মগ্ন হইয়া, এক স্বর্ণময় কুঠার হস্তে লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার? স্বর্ণময় কুঠার দেখিয়া সেই লোভী এই আমার কুঠার বলিয়া, ব্যগ্র হইয়া কুঠার ধরিতে গেল। তাহাকে এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবতা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অভদ্র, ও মিথ্যাবাদী; তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্যপাত্র নহিস। এই ভর্ৎসনা করিয়া, সেই স্বর্ণময় কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া, জলদেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সে হতবুদ্ধি হইয়া নদীর তীরে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল; অনন্তর, আমার যেমন কর্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এই বলিয়া বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।

অনুশীলনী

১। কুঠার ও জলদেবতা গল্পটি হইতে কি শিক্ষা লাভ করিলে?

২। দুঃখী লোকটিকে জলদেবতা কি পুরস্কার দিলেন? কেন দিলেন?

৩। লোভী ব্যক্তির কি ক্ষতি হইল? কেন ক্ষতি হইল?

৪। "আমার যেমন কর্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম,"—এ কথা কে বলিয়াছিল? কেন বলিয়াছিল?

৫। নীচের শব্দগুলির অর্থ (সহজ ভাষায়) লেখঃ—

উচ্চৈঃস্বরে, স্বর্ণময়, রজতময়, তৎক্ষণাৎ, অধিষ্ঠাত্রী, কিয়ৎক্ষণ, বিস্ময়াপন্ন, পূর্ববৎ, অতর্কিত, অনন্তর।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ করঃ—নির্লোভ, অন্তর্হিত।

৭। "আমার যেমন কর্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এই বলিয়া বিষণ্ণ মনে চলিয়া গেল।"—এখানে ক্রিয়াপদগুলি বাহির কর।

৮। বিপরীত অর্থবাচক শব্দ লেখঃ—লোভী, অভদ্র, মিথ্যাবাদী, দুঃখী।

৯। নিচে কতকগুলি দোষগুণের—বিশেষণের উল্লেখ করা হইল। ইহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রথম ব্যক্তির পক্ষে মানায়, কোন্‌গুলি দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—

নির্লোভ, মিথ্যাবাদী, ধর্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, অভদ্র।

১০। প্রথম লোকটির কুঠার কিভাবে জলে পড়ে? দ্বিতীয় ব্যক্তির কুঠার কিভাবে পড়িল?

১১। প্রথম ব্যক্তিকে জলদেবতা প্রথম কির‍ূপ কুঠার দেখান? লোকটি তাহাতে কি বলে? দ্বিতীয়বার জলদেবতা কির‍ূপ কুঠার দেখান? লোকটি তাহাতে কি বলে? জলদেবতার এর‍ূপ আচরণের কারণ কি? এই দ‍ুইটি ঘটনায় লোকটির স্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

১২। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জলদেবতা কির‍ূপ কুঠার দেখান? লোকটি তখন কি করিল? জলদেবতা তাহাকে মাত্র একখানি কুঠার দেখাইবার স‍ুযোগ পান কেন?

১৩। নিচের বাক্যগ‍ুলির কোন্‌টি ভুল, কোন্‌টি ঠিক—

(ক) জলদেবতা লোভী লোকটিকে সোনার কুঠারখানা দিয়াছিলেন।

(খ) জলদেবতা দ্বিতীয় লোকটিকে ভর্ৎসনা করেন।

(গ) দ্বিতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কুঠারখানা জলে ফেলে।

(ঘ) প্রথম ব্যক্তি লোভের বশে কুঠারখানা জলে ফেলে।

Theme:

1. Praise for human values —
prize for honesty and truth, punishment
for dishonesty and lies



—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচয়। জন্ম ২৬শে জুন, ১৮৩৮, মৃত্যু—৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪। ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যসম্রাট নামে অভিহিত করা হয়। হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থা হইতেই ই'হার সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ই'হার অবদান অপরিসীম।,, বঙ্কিমের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির নাম হইলঃ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি। প্রবন্ধসাহিত্যেও বঙ্কিম অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ই'হার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির নামঃ বিজ্ঞানরহস্য, সাম্য, লোকরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি। বাংলা গদ্যকে রূপ ও গুণের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে চরম সীমায় লইয়া গেলেন। উপন্যাস ও প্রবন্ধ দুই শ্রেণীর লেখায়ই তিনি মাতৃ-ভাষাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য করিয়া তুলিলেন। যে কোন চিন্তা প্রকাশ করিতে, যে কোন ভাব ফুটাইয়া তুলিতে, যে কোন বর্ণনায় তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

[**রচনা-পরিচয়।** এই গদ্য রচনাটি যেন ছোট একটি কবিতা। বৃষ্টির একটি বিন্দুর মুখের কথা। কথা দিয়া ছবি আঁকা। বৃষ্টির কত বিচিত্র কাজ—এই ছোট লেখাটিতে তা স্পষ্ট।]

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা এক জনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল কেহ একা নামিও না—অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে এই বিশুষ্ক পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব। নদীগুলির শূন্যহৃদয় ভরাইয়া মহাকল্লোলে ভীম

বাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বহাইয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এসো —সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়ামাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণলতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ। গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে, চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনেবউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব। দে, ওর কাপড় ভিজিয়ে দে।

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বতকন্দর, দেশ-প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্মাণ করিব। বিশীর্ণা তটিনীকে জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে?

অনুশীলনী

১। এই রচনাটি পড়িয়া কি শিক্ষা পাইলে?
২। ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দুর বল কোথায়?
৩। বৃষ্টি মানুষের কি উপকার করে?
৪। বৃষ্টি দেখিয়া পৃথিবীর কিরূপ আহ্লাদ হয়?

৫। নিচের অংশ দুইটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনার অংশ? কোন্ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে? অর্থ ব্যাখ্যা কর।—

(ক) আমরা সহস্র সহস্র......পৃথিবী ভাসাই।

(খ) যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ।

৬। শব্দার্থ লেখ, বাক্য রচনা করঃ—

যূথিকাকলি, রবির কিরণ, মহাকল্লোলে, মহারঙ্গে, পুষ্টি, পর্বতকন্দর, বিশীর্ণা, তটিনী, জাহাজ, আহ্লাদ, আমসত্ত্ব।

৭। "কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্!" "চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে।" এই দুইটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের পদ-পরিচয় দাও।

৮। "যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য।" এ কথা কে বলে? কোন্ প্রসঙ্গে বলে? একা থাকিলে তাহার কি অবস্থা হইবে?

৯। "আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব।" কি ভাবে ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু পৃথিবী রাখিবে?

১০। "আমাদের বল দেখ।" কে বলিল? তাহাদের বলের কি পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছে?

১১। শূন্যস্থান পূরণ করঃ—

নদীগুলির শূন্যহৃদয় ভরাইয়া—ভীম বাদ্য বাজাইয়া তরঙ্গের উপর—বহাইয়া —ক্রীড়া করিব।

Theme.

Unity — How nature teaches the strength of unity and weakness in want of it.

The theme is helpful in developing a sense of unity and integration that though indirectly.



প্রথম কবিতা-লেখা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

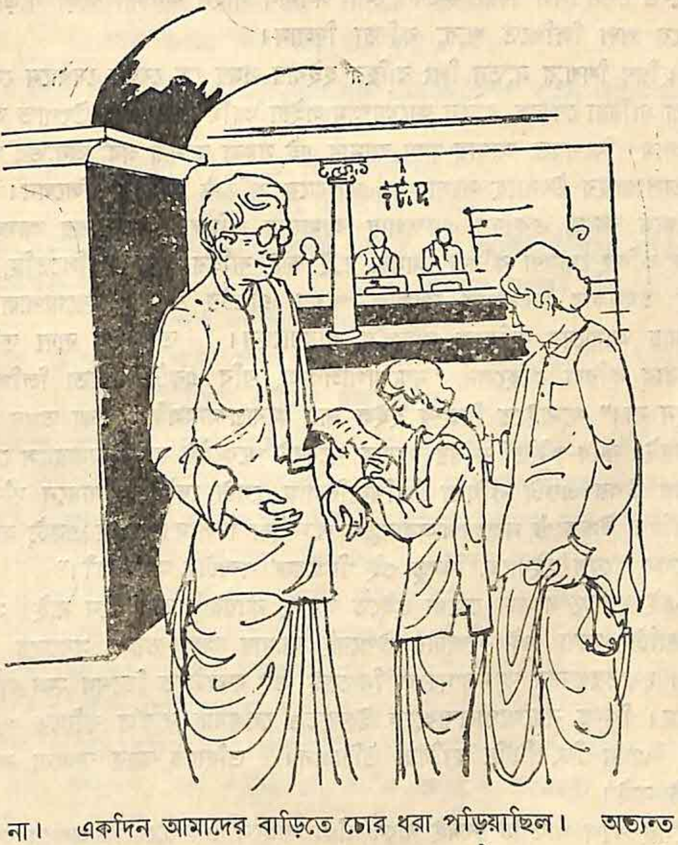
লেখক-পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বিস্ময়কর নাম। মুখ্যত কবি হিসাবেই তাঁর পরিচয় ও খ্যাতি, কিন্তু সাহিত্যের সকল বিভাগই তাঁর দানে সমৃদ্ধ, প্রতিভার স্পর্শে বর্ণময়। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সঙ্গীত, চিত্রকলা—কোথাও তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার দান অকিঞ্চিৎকর নয়। স্বদেশে সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যিকের সর্বোচ্চ গৌরব নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন তাঁর সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। ১২৬৮ সালের (১৮৬১ খ্রীঃ) ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তাঁর জন্ম হয় এবং ১৩৪৮ সালের (১৯৪১ খ্রীঃ) ২২শে শ্রাবণ তাঁর মৃত্যু ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতা এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর পিতামহ। মাতার নাম সারদা দেবী। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির নাম দেওয়া হইলঃ কাব্য—মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, বলাকা, গীতাঞ্জলি, মহুয়া, পুনশ্চ, প্রান্তিক প্রভৃতি; উপন্যাস—রাজর্ষি, গোরা, ঘরে বাইরে প্রভৃতি। নাটক—ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, ফাল্গুনী প্রভৃতি। প্রবন্ধ—কালান্তর, সভ্যতার সংকট, বিশ্বপরিচয় প্রভৃতি।

[**রচনা-পরিচয়।** কবির আত্মজীবনী হইতে এই অংশটি গ্রহণ করা হইয়াছে। বালক বয়সে তিনি যখন প্রথম শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া কবিতা লিখিতে শিখিলেন তখনকার কয়েকটি ছোট ঘটনা এখানে বলা হইয়াছে। খুব মজা করিয়া নিজের জীবনের ঘটনাগুলি লেখক স্মরণ করিয়াছেন।]

আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া

বলিলেন, "তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।" বলিয়া পয়ার-ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতি-পদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

পদ্য জিনিসটিকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিয়াছি। কাটাকুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও সাহস



হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধরা পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরতিশয় কৌতূহলের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মতো। এমন অবস্থায় দারোয়ান যখন তাহাকে মারিতে শুরু করিল, আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। পদ্য সম্বন্ধেও আমার

সেই দশা হইল। গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্যরচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।

ভয় যখন একবার ভাঙিল, তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা যোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্‌সিল দিয়া কতকগুলো অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।

হরিণ শিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। বিশেষত, আমার দাদা আমার এই সকল রচনায় গর্ব অনুভব করিয়া শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।

মনে আছে, একদিন একতলায় আমাদের জমিদারি কাছারির আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় তখনকার 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের এডিটর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া কহিলেন, "নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন না।" শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্যগ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই। কবি-কীর্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তখন অনায়াসে ফেরে। পদ্মের উপর একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেটা দেউড়ির সামনে দাঁড়াইয়া উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, কিন্তু ওই 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী।"

এই দুরূহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম মনে নাই। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে ওই শব্দটার উপরেই আমার আশা-ভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল। দফতরখানার আমলামহলে নিশ্চয়ই ওই কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারিল না। এমন কি, তিনি হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আর কখনো কবিতা শুনাই নাই।

সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরুমোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল। আমি কবিতা লিখি, এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার

বিশেষ স্নেহ ছিল। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।" লিখিয়া যে থাকি সে কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে—

রবি-করে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে।

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

আর একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দবাবু ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। কালো চাপকান পরিয়া দোতলায় আপিসঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুতবেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামী ছিল পাঁচ ছয় জন বড়ো বড়ো ছেলে; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারিতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীত চিত্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লেখ?" কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দবাবুর মতো ভীষণ গম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ সুললিত, তাহা যাঁহারা তাঁহার

ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "পড়িয়া শোনাও।" আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

এই নীতিকবিতাটির প্রশংসা করিবার একটিমাত্র বিষয় আছে—এটি সকাল সকাল হারাইয়া গেছে। ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ইহার নৈতিক ফল যাহা দেখা গেল তাহা আশাপ্রদ নহে; অন্তত, এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কবির প্রতি কিছুমাত্র সদ্‌ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয় আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেহই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই তাহাদের আবশ্যক—প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।

অনুশীলনী

১। বালক রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে কবিতা লিখিতে শিখিলেন?

২। প্রথম কবিতা লিখিতে শিখিয়া বালক রবীন্দ্রনাথ কিরূপ ব্যবহার করিতে শুরু করিলেন?

৩। নবগোপাল মিত্র কে? কবিতা লেখার বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল?

৪। বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা লইয়া স্কুলে কি কাণ্ড হইয়াছিল?

৫। নিচের অংশগুলি কোন্ লেখার অন্তর্গত? লেখক কে? কোন্ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে? অর্থ বুঝাইয়া বল।

(ক) গোটা কয়েক শব্দ......টিকিল না।

(খ) হরিণ শিশুর নূতন শিং......আরম্ভ করিলাম।

(গ) এই নীতিকবিতাটির......হারাইয়া গেছে।

(ঘ) বিশ্বাস করাই......হইতে পারে।

(ঙ) তাহারা যে পথ......প্রশস্ত পথ নহে।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর:—
সদ্‌ভাব, পদার্পণ, পদ্ধতি, কাব্যোদ্গম, অধিকাংশ, বিদ্যালয়।

(৭) শব্দার্থ লেখ—সংগ্রহ, সুললিত, আশাপ্রদ, কবিযশঃপ্রার্থী, দফতরখানা, গম্ভীর, পীড়াপীড়ি, প্রশস্ত।

৮। শেষ অনুচ্ছেদের বিশেষণ পদগুলি বাছাই কর।

৯। সাতকড়ি দত্ত কে ছিলেন? তিনি বালক রবীন্দ্রনাথকে কি করিতে বলিয়াছিলেন? তাঁহার কোন্ কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কোন্ কবিতা জুড়িয়া দিয়াছিলেন?

১০। খাবার বিষয় নিয়া বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত কর। উহার সরলার্থ কি?

১১। গোবিন্দবাবু কে? তাঁহার সঙ্গে বালক রবির কিভাবে পরিচয় হইয়াছিল? ঐ পরিচয়ের পর তিনি বালককে কি চক্ষে দেখিতেন?

১২। গোবিন্দবাবু তাঁহাকে কেন ডাকাইয়াছিলেন? তিনি রবীন্দ্রনাথকে কি করিতে বলিয়াছিলেন? বালক এই নির্দেশ পালন করিয়াছিল কি? উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইল?

১৩। নবগোপাল মিত্র, ন্যাশনাল, জ্যোতিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

১৪। কে বালক রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লিখিতে শেখায়? প্রথম কবিতা লিখিতে শিখিয়া তাঁহার কি মনে হইল?

Theme

Cultivation of poetry — a literary theme ~~[illegible]~~ apparently unrelated with national integration.
Truth ultimately triumphs — Rabindranath in his childhood has proved it.



রামের পোষা মাছ

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচয়। বাঙালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তায় শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর সমকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। রবীন্দ্রনাথ হইতে তিনি বয়সে ছিলেন পনের বৎসরের ছোট এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার বিস্ময়কর প্রকাশের পাশাপাশিই তিনি আপন শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিয়া বাঙালী পাঠকের চিত্তে নিজের আসন অধিকার করিয়া নিয়াছেন। পারিবারিক জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার চিত্র অঙ্কনে এবং সামাজিক জীবনের বাস্তব রূপ অঙ্কনে শরৎ-চন্দ্রের শক্তি ছিল অসামান্য। পরবর্তীকালের শক্তিধর ঔপন্যাসিকেরাও তাঁর সে গৌরব ম্লান করিতে পারেন নাই। মানব-হৃদয়ের বিশ্লেষণে তাঁর স্বাভাবিক একটি নিপুণতা ছিল। তুচ্ছ, অবহেলিত মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম মমতা ছিল। এমন কি যাহারা সমাজের চোখে অপরাধী বলিয়া বিবেচিত, শরৎচন্দ্র তাহাদের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও সুবিচার দাবি করিয়াছেন। তাই বাঙালী পাঠকের কাছে তিনি 'দরদী কথাশিল্পী' রূপে পরিচিত।

[**রচনা-পরিচয়।** লেখকের 'রামের সুমতি' গল্প হইতে এই অংশটুকু গ্রহণ করা হইয়াছে। রাম নামক একটি বালকের ছেলেমানুষি এবং দুরন্তপনা এই কাহিনীর বিষয়।]

বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের রুইমাছ ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে দুটা আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্তিক, গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না, যে ব্যক্তি কার্তিক-গণেশের অসাধারণ রূপ-গুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই, এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে তাহাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত, এবং কে কার্তিক, কে গণেশ, সে-ই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিতে না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

বৌদি নারায়ণী হাসিয়া বলিতেন, রামের কার্তিক-গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

সেদিন রাম পুকুর ধারে আসিয়া দেখিল তাহার কার্তিক-গণেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলো মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকচ!

ভগা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়ে গিয়েছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না, দা'ঠাকুর!

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, দূর হ!

ভগা জাল তুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগম্বরী আজ সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না দিদিমা। ছোটবাবু ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধরে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাছ দুইটার উপর দিগম্বরীর দৃষ্টি ছিল। নিজের কোন একটা কাজে স্বহস্তে রাঁধিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণের পাতে দিয়া পুণ্য ও খ্যাতি অর্জন করিবার বাসনা অনেকদিন হইতে তিনি মনে পোষণ করিতে-ছিলেন। কাল জামাইয়ের মত লইয়া, অর্থাৎ কার্তিক-গণেশ সম্বন্ধে আভাস মাত্র না দিয়া, জেলেদের মোটা জাল চাহিয়া আনাইয়া, প্রজা ভগা বাগ্দীকে চার আনা বক্‌সিস্‌ কবুল করিয়া সমস্ত আয়োজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। এমন সময় এরূপ দুঃসংবাদ তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, গলার মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে কি শত্তুর আমার! কবে ছোঁড়া মরবে যে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে। বাসিমুখে এখনো জল দিইনি ঠাকুর! যদি সত্যের হও, যেন তে-রাত্তির না পোহায়।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারী কুটিতেছিলেন। তিনি বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, মা! শুনিয়াছি, সন্তানের মুখে মাতৃ-সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনের আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। ঐ এক অক্ষরের ডাকে দিগম্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল; কিন্তু নারায়ণীও আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে

তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া টপ্-টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরী করিতেছিল, সেখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধরে হাঁকিয়ে দিয়েছিস ?

রাম চমকাইয়া শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্ত তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা না করিয়া ওদিকের দরজা দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগ্দীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ধড়াস করিয়া উঠানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মাছ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, এ রামের কার্তিক-গণেশ নয় ত?

ভগা এত শীঘ্র এত বড় মাছ আনিতে পারিয়া বাহাদুরী করিয়া বলিল, এজ্ঞে হাঁ মা-ঠাকরুণ। দিগম্বরীকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, ও মা-ঠাকরুণ এনারেই ধ'ত্তে বলে দেছ্‌ল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নৃত্যকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগম্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা, পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কার্তিক-গণেশের কথা। তুমি কি ব'লে এ মাছ ধ'রতে বলেছিলে? দু-তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না ? দশটা লোকে খাবে, তা একটা আধমণি মাছই বা কি হবে? লুকিয়ে ফেল একে, কোথায় গেছে তিনি, এখনি এসে পড়বে।

দিগম্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, জানি না অতশত। একটা মাছ ধরেচে ত সাতগুষ্ঠি মিলে কি করচে দেখ না। একে লুকিয়ে ফেলবি, বামুন খাবে না ?

নেত্য বলিল, তোমার বামুন খাবে দুটো আড়াইটের সময়। ঢের সময় আছে। ছোটবাবু আগে ইস্কুলে যাক্; না হলে আজ আর কেউ বাঁচবে না! ও মা? ভোলা এই যে দাঁড়িয়েছিল সে গেল কোথায়? সে বুঝি তবে খবর দিতে ছুটেচে!

প্রয়োজন হইলে, কখন কোন স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া

উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখ্‌বে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কার্তিককে মেরেচে।



রাম ঝুপ্‌ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে। বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে লাগিল।

অনুশীলনী

১। রামের পোষা মাছ কে ধরাইয়াছিল? কেন ধরাইল? তাহাতে রামের মনের অবস্থা কিরূপ হইল?

২। প্রত্যেকের স্বভাব লইয়া দুইটি করিয়া বাক্য লেখঃ—

(ক) রাম (খ) নারায়ণী (গ) দিগম্বরী।

৩। নিচের অংশগুলি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে? উদ্ধৃত অংশগুলি বুঝাইয়া দাও।

(ক) নারায়ণীর মুখে......তুলনা ছিল না।

(খ) বলিয়াই মাটির উপর......ছুঁড়িতে লাগিল।

৪। বাক্য রচনা করঃ—

পুণ্য ও খ্যাতি, কাটা ছাগলের মত, ঝুপ্ করিয়া, ধড়াস করিয়া, অতশত।

৫। "বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে। বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে লাগিল।"—উপরের অংশ হইতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ খুঁজিয়া বাহির কর।

৬। ৫নং প্রশ্নের উদ্ধৃতিটি কাহার উক্তি? সে কেন একথা বলিল? তাহার কি মনোভাব ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে?

৭। কার্তিক-গণেশ কাহাদের নাম? উহাদের সঙ্গে রামের সম্পর্ক কি ছিল?

৮। "কবে ছোঁড়া মরবে যে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে।" কে কাহার সম্বন্ধে কখন্ এই কথা বলে? কেন বলে?

৯। গণেশকে ধরিবার পরে নারায়ণী এবং নৃত্যকালীর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল? রামকে কে খবর দিল? খবর শুনিয়া রাম কি করিল?

Theme

1. Human values —
Child's love for pets

কারবালার কাঁদন

—শেখ ফজলল্ করিম

লেখক-পরিচয়। ছোটদের জন্য কাহিনী ও প্রবন্ধ লিখিয়া ফজলল্ করিম খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। করিম সাহেবের লেখা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যাইত।

[রচনা-পরিচয়। কারবালার মাঠে হোসেনের মৃত্যুর বিখ্যাত কাহিনী লেখক মর্মস্পর্শী ভাষায় সংক্ষেপে বলিয়াছেন।]

মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদের চার মেয়ে—সব ছোট মেয়েটির নাম ফাতেমা।

মা-মরা ফাতেমা, বাপের বড় দুলালী মেয়ে। বিবাহের বয়স হইলে হজরত, আলীর সঙ্গে ফাতেমার বিবাহ দিলেন। আলীকেও হজরত প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। ছোটকাল হইতেই এই ছেলেটি তাঁহার সুখদুঃখের সঙ্গী। কিছুদিন পরে ফাতেমার দুই ছেলে হইল। বড়টির নাম হাসান আর ছোটটির নাম হোসায়েন। হাসান-হোসায়েন দুইভাই এক বৃন্তে দুই ফুলের মতন দিনে দিনে ফুটিতে লাগিলেন। হজরত মোহম্মদ এই ছোট সাথীদের সঙ্গে হাসেন, খেলেন, আমোদে দিন কাটান।

ক্রমে হজরতের দিন ফুরাইল। তাঁহার মৃত্যুর পর আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী একে একে খলিফার (ধর্মের রক্ষক) পদে বসিলেন। আলী গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হইলে তাঁহার বংশের দুলাল এমাম হাসানকে লোকে খলিফা করিল। এই সময়ে মাবিয়া নামে এক ব্যক্তি দামাস্কাস নগরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এমাম হাসান অতিশয় সরল ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজ-রাজ্যে, আমার কি প্রয়োজন? হোক না মাবিয়া খলিফা; আমি আমার মত ধর্মকাজ করিয়া জীবন কাটাইব। এই ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, মাবিয়ার কাজে বাধা দিতে গেলেন না। কিন্তু মাবিয়ার ছেলে এজিদ ছিল বড় দুষ্ট লোক। সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সে মনে করিল, এমাম হাসান বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে আমার সমূহ বিপদ। সুতরাং যেরূপেই হোক্, শত্রুকে নিপাত করিতে হইবে। অবশেষে কুচক্রী এজিদ বিষ দিয়া তাঁহাকে হত্যা করাইল।

পিতা মাবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ দামাস্কাসের সিংহাসনে বসিল। মন্দ লোককে কেহই ভালবাসে না; এজিদও লোকের ভালবাসা পাইল না। মক্কা,

মদিনা এবং কুফা—তিন স্থানের লোকেরাই ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল—"আমরা এজিদকে মানি না। আমাদের খলিফা—নবীবংশের শেষ প্রদীপ হোসায়েন।"

কুফার মুসলমানেরা সাধু হোসায়েনকে খলিফা পদ গ্রহণের জন্য বারম্বার ডাকিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের ডাকে ৭২ জন মাত্র সঙ্গী লইয়া কুফা নগরে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে পুত্র-পরিজনেরাও চলিলেন। কিন্তু দৈবের লেখা —হজরত হোসায়েন পথ ভুলিয়া আর একদিকে চলিয়া গেলেন। এজিদ জানিতে পারিয়াছিল যে, হোসায়েন কুফা যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে পথে আটকাইবার জন্য তাড়াতাড়ি সেনাপতি ওবায়দুল্লাকে পাঠাইয়া দিল। হোসায়েন বাধা পাইয়া এবার অন্যদিকে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার ঘোড়ার পা মাটিতে বসিয়া গেল দেখিয়া তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। কারবালার বালুকাময় প্রান্তরে হোসায়েনের শিবির পড়িল।

শত্রুসেনারা আগে হইতেই ফোরাত (ইউফ্রেতিস্) নদীর জল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। হোসায়েনের শিবিরে জলের অভাবে হাহাকার উঠিল। অনুচরেরা মরিয়া হইয়া এজিদের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিতে লাগিলেন।

মহামতি হোসায়েন পুত্রকে বুকে ধরিয়া একবিন্দু জলের আশায় নদীর দিকে চলিলেন। সহসা শত্রুর তীর আসিয়া শিশুর বুকে বিঁধিল,—পিয়াসী শিশুর সকল জ্বালা জুড়াইল। শোকার্ত হোসায়েন শিবিরে ফিরিয়া পত্নীর কোলে ছেলে দিয়া বলিলেন—"এই নাও, জন্মের শোধ বাছার পিপাসা মিটিয়াছে।"

হাসান-পুত্র কাসেম অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়া পিতৃব্যকে কহিলেন,—"অনুমতি করুন, শত্রুকুল নির্মূল করিয়া আমি জল লইয়া আসি।" কাসেম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। হোসায়েনের পুত্র বালক জয়নাল আবেদীন যুদ্ধে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু হোসায়েন তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিলেন না। স্ত্রী শহরবানুকে বলিলেন—"আমি থাকিতে নবীকুলের শেষ শিখা নিভিতে দিতে পারি না। আমার পর তুমি ইহাকে দেখিও।"

শোকাকুল হোসায়েন 'দুল্ দুল্' নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন। পিপাসায় তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তবু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেদিন হোসায়েনের শরাঘাতে এজিদের শত শত সৈন্য প্রাণ হারাইল। নদীতীর শত্রুহীন দেখিয়া শ্রান্ত হোসায়েন অশ্ব হইতে অবতরণ

করিলেন। তিনি জলের কিনারায় আসিয়া এক আঁজলা জল মুখে তুলিয়াছেন, এমন সময় মনে পড়িল—হায়! হায়। এই জলের অভাবে আমার জীবনের সঙ্গীরা একে একে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন,—পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ গিয়াছে। হোসায়েনের আর জল পান হইল না। তিনি জল ফেলিয়া দিয়া উঠিলেন এবং তীরবেগে শত্রুসেনার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল। সত্তরটি বিষমাখা তীর ক্রমে ক্রমে তাঁহার কোমল তনু জর্জরিত করিল, রক্তের ধারায় বস্ত্র রাঙিয়া উঠিল, তিনি অবসন্ন দেহে ঢলিয়া পড়িলেন।

দুলদুল এ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া ডাকিতে ডাকিতে শিবিরের দিকে ছুটিল। ঘোড়া ফিরিল, কিন্তু ঘোড়ার মালিক ফিরিলেন না দেখিয়া সকলেই অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। শিবিরে তখনও যে কয়জন জীবিত ছিলেন তাঁহাদের কান্নার রোলে আকাশ কাঁপিল বাতাস থামিল। 'হায় হোসায়েন' 'হায় হোসায়েন' রবে কারবালার মরুময়দান ফাটিয়া চৌচির হইল।

শিমার এক পাপিষ্ঠ। অর্থের লোভে সে এমামের গলায় ছুরি বসাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ছুরি বসিল না। হোসায়েন ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"অনর্থক কষ্ট দিও, না। আমার মাতামহ হজরত মোহম্মদ সর্বদা ঐ স্থানে চুমো দিতেন। ওখানে তোমার ছুরি বসিবে না,—ছুরি অন্যদিকে চালাও।" ছুরি চলিল, মাথাও কাটা হইল। এজিদ সে মাথা পাইয়া মনের সাধে হাসিল।

কিন্তু ফোরাতের কূলের সেই "হায় হায়" রব আজিও থামিয়া যায় নাই। রক্তরাঙা মহরম উৎসবে এখনও মুসলমানের "হায় হোসায়েন", "হায় হোসায়েন" মাতন শুনিতে পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

১। কারবালা কি? সেখানে কাহার মৃত্যু হইয়াছিল? কিভাবে হইয়াছিল?
২। হজরত মোহম্মদ কে? তাঁহার দুই দৌহিত্রের নাম কি?
৩। মাবিয়া কে? এজিদ কে? এজিদ হাসান-হোসায়েনের প্রাণ বধ করিতে চাহিয়াছিল কেন?

৪। নিচের অংশগুলি কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? কাহার লেখা? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর। অংশগুলির ব্যাখ্যা কর।

(ক) হোক না মাবিয়া খলিফা......কাটাইব।

(খ) রক্তরাঙা মহরম্......পাওয়া যায়।

৫। লিঙ্গান্তর কর:—মাতামহ, ভাই, সরল, পত্নী, ঘোড়া।

৬। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর:—দুলালী, সঙ্গী, স্বাধীন, ধার্মিক, কুচক্রী, প্রান্তর, মরিয়া, শোকার্ত, অনুমতি, অবতরণ, চৌচির, অনর্থক, রক্তরাঙা।

৭। "ছুরি চলিল......হাসিল।"

উদ্ধৃত অংশের ক্রিয়াপদগুলি বাহির কর। এখানে ক্রিয়ার কোন্ কাল—অতীত না ভবিষ্যৎ?

৮। এই রচনার শেষ বাক্যটি হইতে একটি বিশেষণ পদ নির্বাচন করিয়া তাহার দ্বারা বাক্য রচনা কর।

৯। "ওখানে তোমার ছুরি বসিবে না—" কে কাহাকে এই কথা বলেন? কখন বলেন? ওখানে ছুরি বসিবে না কেন?

১০। দুল্দুল্ কে? শিমার কে? ইহাদের মধ্যে কে ইতিহাসে বিখ্যাত কে কুখ্যাত হইয়া আছে? কেন?

১১। "আমি থাকিতে নবীকুলের শেষ শিখা নিভিতে দিতে পারি না।" এ কথা কে কখন কাহাকে বলেন? 'নবীকুল' মানে কি? বক্তা এই কথা বলার পরে কি করিলেন?

Theme

misdeeds wins for the time being but courage and sacrifice wins for ever.

পালামৌ পাহাড়ে

—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-১৮৮৯) উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিতেন। 'পালামৌ' ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

[**রচনা-পরিচয়।** পালামৌ-এর পর্বতময় বনের মধ্যে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অতি মনোরম ভঙ্গীতে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন।]

এক

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোরম দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে; নিম্নে সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই, কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন,—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।

একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয় একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার, ঝর্ ঝর্ করিতেছে। তাহার একস্থান অনেকদূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে; সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে।

অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল। পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে।



অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকির পরিবর্তে এক একখানি গোল আরসি; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ-বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে। কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান, তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল, চারিদিকে কাল পাথর, পশুও পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

দুই

আর একদিনের কথা বলি। যেরূপ নিত্য অপরাহ্ণে লাতেহার পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম। পথে দেখি, একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে।

যখন আমি নিকটবর্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে।" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্ট দোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোটপেণ্টুলন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং একথা না বলিলে ভাল দেখায় না; বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে।

যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতদূর গিয়া মৃদু স্বরে আমাকে বলিল, "আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে।" আমি জুতা খুলিয়া খালি পায়ে চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটি গর্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তরনির্মিত একটি কুটীর, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যেদিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেইদিকে চলিল। আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।" তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম; শেষে একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি।" উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা একা তাহা ঠেলিয়া গর্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোর রবে প্রাঙ্গণে পড়িল, শব্দ কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙিল না। পরদিবস বাহকস্কন্ধে ব্যাঘ্রটি আমার তাঁবু পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।

অনুশীলনী

১। যুবক সদর্পে কি বলিয়াছিল? কিভাবে সে বাঘ মারিল?

২। পালামৌর পাহাড়গুলি কেমন দেখিতে? জঙ্গলগুলিই বা কেমন?

৩। কাহাদের দেখিয়া লেখকের মনে হইল "যেন কৃষ্ণঠাকুর"? তাহাদের বর্ণনা দাও।

৪। কাহার লেখা, কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ কর এবং ব্যাখ্যা করঃ—(ক) যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে.........সেইরূপ।
(খ) তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন......হইল না।

৫। অর্থ লেখঃ—মনোহর, সমুদয়, কুঞ্চিত, সমাচ্ছাদিত, কর্ষিত, বিচলিত, সংখ্যাতীত, চমৎকৃত, সংকীর্ণ, বিস্ময়কর, তৃণাবৃত, কান্তি, কৃষ্ণবর্ণ, পরিধানে, ধড়া, অপরাহ্ণ, অপ্রতিভ, দীর্ঘিকা, চতুঃপার্শ্বস্থ, দর্পণ।

৬। লিঙ্গান্তর করঃ—ব্যাঘ্র, যুবা, স্ত্রীলোক, বাঘ, সাহেব, মহিষ, কোলবালক।

৭। "একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম।"—এই বাক্যের পদগুলির পরিচয় দাও।

৮। "যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।" এই বাক্যটির অর্থ কি? কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হইয়াছে?

৯। পাহাড়গুলি কিভাবে দূর হইতে কাছে লেখকের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল? লেখক পাহাড়ের কাছে আসিয়া কি দেখিলেন?

১০। শুধু পাহাড়ের (জঙ্গল ছাড়া) যে রূপটি এই রচনায় আছে তাহা নিজের ভাষায় বল।

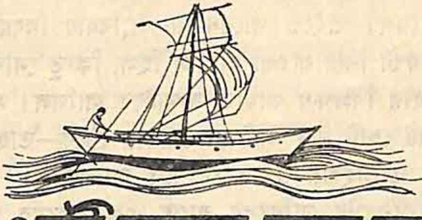
১১। পাল্কী চাপিয়া বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে লেখকের কি অভিজ্ঞতা হইল?

১২। প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে লেখক কি দেখিলেন?

১৩। "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি"—এ কথা কে কাহাকে বলে? সে কেন বাঘ মারিতে যাইতেছিল? সে কি বাঘ মারিতে পারিয়াছিল? পারিয়া থাকিলে কিভাবে?

Theme

1. Knowing the unknown
2. Courage and determination can defeat the enemy.



একটি অদ্ভুত সমুদ্রভ্রমণ

—উপেন্দ্রকিশোর রায়

লেখক-পরিচয়। ছোটদের জন্য নানা ধরনের গল্প ও ছড়া লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন উপেন্দ্র কিশোর (১৮৬৩—১৯১৫)। "টুনটুনির বই" তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাঁর "সন্দেশ" শিশু-কিশোরদের উপযোগী শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া ওঠে।

[**রচনা-পরিচয়।** প্রায় একশ বছর আগেকার এক দুঃসাহসী ব্যক্তির সমুদ্র-ভ্রমণের বাস্তব বর্ণনা আছে এই রচনাটিতে। লেখার গুণে সেই বর্ণনা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।]

ইউনাইটেড্ স্টেট্সে গিলফয় সাহেবের বাড়ী। গিলফয় সাহেব বড় মজার লোক। বয়স ৩৩ বৎসর হইবে। সাহেব এই বয়সটা প্রায় জাহাজে থাকিয়াই কাটাইয়াছেন। জাহাজে চড়িয়া কত দেশে গিয়াছেন, কত তামাসা দেখিয়াছেন, কিন্তু একা ছোট নৌকায় প্রশান্ত মহাসাগর পার হন নাই, এই দুঃখে সাহেবের মন আর ঠাণ্ডা হয় না। ছুতোরকে বলিলেন, "আমাকে একখানা নৌকা গড়িয়া দাও।" ছুতোর তাহাই করিল। নৌকা দৈর্ঘ্যে ১২ হাত, চওড়ায় ৪ হাত, আর উঁচুতে ২ হাত হইল। ৫৫ মণ জিনিস ধরে। নাম রাখিলেন 'প্যাসিফিক্'। সাহেব বলিলেন, জল-বিহার করিয়া করিয়া অষ্ট্রেলিয়া যাইব। অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকা হইতে প্রায় ৬০০০ মাইল দূরে।

পাঁচ মাসের আন্দাজ খাদ্যসামগ্রী নৌকায় উঠান হইল। ১৮৮২ সালের ১৯-এ আগষ্ট গিলফয় সাহেব যাত্রা করিলেন। প্রথম সপ্তাহ বেশ সুখে সুখে গেলেন—তবে নৌকা বড় নীচু বলিয়া জল ছিটিয়া খাবার জিনিসগুলি ভিজাইয়া দিতে লাগিল,—এই একটু অসুবিধা। এরপর প্রায় একমাস পর্যন্ত কোন দিন বাতাস পান, কোন দিন বা বাতাস থাকেই না; আর দলে দলে মাছ এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ আসিয়া নৌকা ঘিরিয়া তামাসা দেখে। বাতাস নাই, পথ এগোয় না; খাবার জিনিসও বেশী নাই। সাহেব দেখিলেন অত বেশী খাইলে চলিবে না। এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে এই সময়ে সাহেবের ক্ষুধা

হ্রাস হইয়া উঠিল। বেশী খাইতে পারেন না—সুবিধার বিষয়ই হইল। ভোর হইবার পূর্বে ৩।৪ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস ছিল, কিন্তু নৌকার নীচে কিসে ঠক্ ঠক্ করিয়া তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সাহেব দেখিলেন হাঙগরের তাড়ায় ছোট ছোট মাছ আসিয়া নৌকায় ঠেকে—তাহাতেই এই শব্দ হয়। তিনি হাঙগর তাড়াইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

তোমরা অনেকে বোটের মাঝিদের হাতে এক রকমের লগী দেখিয়াছ, তাহার মাথায় লোহার একটা বড়শির মত লাগান থাকে। সাহেবের এর একটা ছিল। তিনি তাহার অগ্রভাগটা সোজা করিয়া লইলেন। এই অস্ত্র হাতে করিয়া তিনি হাল ধরিয়া বসিতেন আর হাঙগর কাছে আসিলেই সুট্ করিয়া ঘা মারিতেন। হাঙগরগুলি ভয় পাইল, তিনি যতক্ষণ বাহিরে বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ আর কাছে আসিতে সাহস পাইত না। ঘুমাইবার সময় একটা পিরাণ বসিবার জায়গায় লট্‌কাইয়া রাখিতেন; তাহাতে হাঙগরগুলি মনে করিত মানুষটাই বুঝি বসিয়া রহিয়াছে; সুতরাং ঠক্‌ঠকি থামিল।

১০ই নভেম্বর একখানা জাহাজ দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কাছে গিয়া কিছু খাবার চাহিয়া লইলেন। তার পর কয়েক দিন এত বাতাস পাইয়াছিলেন যে একদিন প্রায় ১০৬ মাইল গিয়াছিলেন।

১৪ই ডিসেম্বর ঝড় তুফানের দিন; একটা বড় ঢেউ আসিয়া তাঁহার নৌকাখানি উল্টাইয়া ফেলিল। সাহেব সাঁতরিয়া নৌকার পাশ দিয়া গেলেন, এবং নঙগরের দড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে করিতে এক ঘণ্টায় নৌকাটিকে সোজা করিলেন। জল সেঁচিতে গিয়া তিনি কিছু বেশী হুড়ো-হুড়ি করিতে লাগিলেন—নৌকাখানি আবার উল্টাইয়া গেল। দ্বিতীয়বার নৌকা সোজা করিতে তত কষ্টবোধ হইল না; এবার খুব সাবধান হইয়া জল সেঁচিলেন।

এই গোলমালে সাহেবের ঘড়ি-কম্পাস হারাইয়া গেল। কিছুকাল পরে একটা কিরিচ মাছ আসিয়া নৌকার গায় ছিদ্র করিয়া দিয়া গেল। সাহেব তখন টের পাইলেন না। কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন নৌকায় জল উঠিয়া জিনিসপত্র ভাসিতেছে, তখন চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি ছিদ্র বন্ধ করিলেন।

নূতন বৎসর আসিল। ৭ই জানুয়ারী একটি পাখী উড়িয়া নৌকায় আসিল; সাহেব তাহা ধরিয়া খাইলেন। ১১ই জানুয়ারী আর একটি পাখী ধরিলেন। কখন কখন দুই একটি "উড়ুক্কু" মাছ নৌকায় আসিয়া পড়িত; তাহাও বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিতেন। ১৬ই তারিখ তাঁহার হালটি ভাঙিয়া

গেল; তিনি আর একটি করিয়া লইলেন। ইহার পর একদিন আর একটি পাখী ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ২১-এ হইতে ক্ষুধায় তাঁহাকে রোগা করিতে লাগিল। নৌকার গায়ে যে সমস্ত শামুক ছিল তাহার বড়গুলি চুষিয়া খাইলেন। আর একদিন গুলি করিয়া একটি পাখী মারিয়াছিলেন; কিন্তু জল হইতে উঠাইতে পারিলেন না। ৩০-এ একটি পাখী ধরিয়া দেশলাইয়ের আগুনে পোড়াইয়া খাইলেন।

তার পর এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহার প্রতি মনোযোগ রহিল না। একদিন হেঁট মস্তকে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিলেন—একটা জাহাজ। তিনি আনন্দে সেই জাহাজের দিকে যাইতে লাগিলেন, জাহাজের লোকেরাও দেখিতে পাইয়া জাহাজ ফিরাইল। Theme

1. adventure — courage / determination / strong will overco obstacles & brings success.

অনুশীলনী

১। গিলফয় সাহেবের স্বভাবটি কেমন—পাঁচটি বাক্যে বল।

২। সাহেবের নৌকাটি কেমন? তাহাতে কি কি জিনিস ছিল? তাঁহার সমুদ্র যাত্রার উদ্দেশ্য কি ছিল?

৩। হাঙ্গরের আক্রমণ হইতে সাহেব কিভাবে আত্মরক্ষা করিলেন?

৪। নৌকাডুবিতে সাহেব কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন? কিরূপে রক্ষা পাইলেন।

৫। শেষ দিকে সাহেবের কিরূপ খাদ্যাভাব হইয়াছিল তাহার বর্ণনা দাও।

৬। উড়ুক্কু মাছ, কিরিচ মাছ, হাঙ্গর—এই প্রাণীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। যাত্রার প্রথম দিকে সাহেব কি কি অসুবিধায় পড়িলেন? তাহা দূর করিবার কিরূপ চেষ্টা করিলেন?

৮। কিভাবে সাহেবের নৌকা উল্টাইয়া গিয়াছিল? কিভাবে তিনি উহা সোজা করেন? দ্বিতীয়বার নৌকা উল্টাইল কেন?

৯। কিরিচ মাছ সাহেবের কি ক্ষতি করিল? সাহেব কিভাবে সেই ক্ষতি-পূরণ করিলেন?

১০। শেষদিকে সাহেবের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? সেই চূড়ান্ত বিপদ হইতে কিভাবে তিনি উদ্ধার পান?

১১। নিচের অংশ কাহার লেখা কোন্ রচনার অংশ? কি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে? বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।—"জাহাজে চড়িয়া কত......ঠাণ্ডা হয় না।"

১২। শব্দার্থ লেখঃ—তামাসা, জল-বিহার, সামুদ্রিক, হ্রাস, বিলক্ষণ, পিরাণ, হুড়োহুড়ি।

জাত যায় কি করে

—শশিভূষণ দাশগুপ্ত

লেখক-পরিচয়। শশিভূষণ (১৯১১—১৯৬৪) বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। খুব বড় পন্ডিত—"শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ", "ত্রয়ী" প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বই লিখিয়াছেন। কিন্তু ছোটদের জন্যও তাঁর গদ্য ও পদ্যে কয়েকটি সুন্দর সরল বই আছে।

[**রচনা-পরিচয়।** স্বামী বিবেকানন্দের বালক বয়সের গল্প বলিয়াছেন লেখক। তাঁহার বাল্যকালের দুরন্তপনার মধ্যেও মহৎ ভাবনা লুকাইয়া থাকিত—ইহাই লেখক দেখাইয়াছেন।]

স্বামী বিবেকানন্দের ছোটবেলার ডাক নাম ছিল বিলে। কত অদ্ভুত খেয়ালই না আসত বিলের মাথায়।

তখন তার বাবা বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় আসতেন নানারকমের মক্কেল। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বুড়ো মুসলমান। এই বুড়ো মানুষটি বিলেকে বড় ভালোবাসতেন, বিলেরও লোকটিকে বড় পছন্দ ছিল। তার কারণও ছিল। লোকটির বাড়ি ছিল আফগানিস্থানের দিকে। সেখান থেকে তাঁরা ভীষণ পাহাড়ী বনে উটের পিঠে বা ঘোড়ার পিঠে কি ক'রে আসেন ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে, তারই নিত্যনোতুন গল্প করতেন লোকটি বালক বিলের কাছে। বিলে ব'সে ব'সে শুনত—আর ভাবত ব'সে সেই সব দূর দূর দেশ আর দুর্গম পাহাড়ী পথের কথা।

লোকটি মাঝে মাঝে বিলের জন্য মিষ্টি নিয়ে আসতেন, খুশী হ'য়ে অন্য সব মক্কেলের সামনে তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে বিলে খেতে থাকত। মুসলমানের হাত থেকে হিন্দুর ছেলে নিয়ে নিয়ে খাবার খাচ্ছে—অনেকের জিনিসটা ভাল লাগত না, মুসলমান মক্কেল চ'লে গেলে অনেকেই অনেক দিন বিলেকে বলেছে,—অমন আর করো না খোকা, ওতে জাত যায়।

জাত যায়? সেটা আবার কি? মানুষের জাত আবার যায় কি করে? বিস্ময় লাগে বালক বিলের মনে।

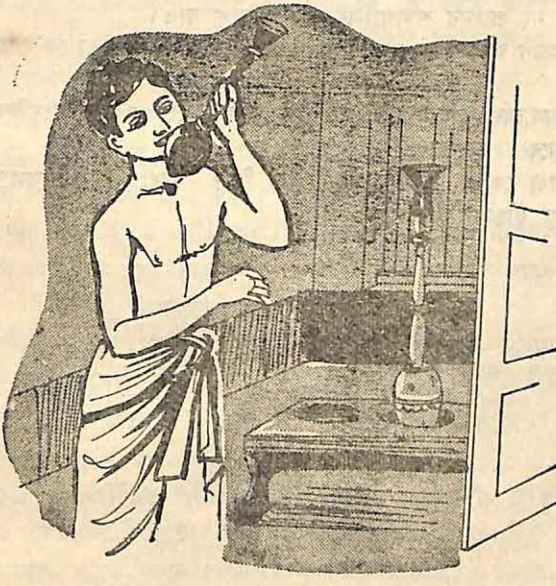
তারপর বিলে একদিন লক্ষ্য করল, বাবার বৈঠকখানার ঘরে টাঙানো রয়েছে

অনেক রকমের হুঁকো—মুসলমানের হুঁকো, কায়েতের হুঁকো, বামুনের হুঁকো।

বিলে লক্ষ্য করেছে, কেউ অন্য কারোর হুঁকোয় তামুকটি পর্যন্ত খাবেন না, তাতেও নাকি জাত যায়।

বিলে আবার ভাবে, মানুষের জাতটা আবার যায় কি ক'রে? একদিন তো নিজে একটু না দেখলে নয়!

একদিন আর কেউ যখন ঘরে নেই তখন বিলে বাবার বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই সে ওঘরে সারি সারি যে ক'টা হুঁকো ছিল সবটাতেই একবার ক'রে মুখ দিয়ে ভুড়ুক ক'রে টান মারল।



এমন সময় পিতা বিশ্বনাথ ঢুকে পড়েছেন সেই ঘরে; বিলের কাণ্ড দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'একি বিলে, এটা কি হচ্ছে?'

বিলে বলল, 'মানুষের জাতটা চলে যায় কি ক'রে সেইটে একবার দেখছিলুম।'

'বটেরে'—বলে বিশ্বনাথ হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

অনুশীলনী

১। বিবেকানন্দকে ছোটবেলায় কি নামে ডাকা হইত? আফগান লোকটির কাছে সে কিসের গল্প শুনিত?

২। মুসলমানের হুঁকো, কায়েতের হুঁকো, বামুনের হুঁকো—বলিতে কি বুঝায়?

৩। বালক বিলে কিভাবে জাতের পার্থক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন?

৪। প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা কর:—(ক) জাত যায়? সেটা আবার কি?

৫। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর:—মক্কেল, টাঙানো, বৈঠকখানা, দুর্গম, ব্যবসা, ভুড়ুক, হো হো।

৬। ৫ নং প্রশ্নের শব্দগুলির পদ পরিচয় দাও।

৭। "অমন আর করো না খোকা, ওতে জাত যায়।" একথা কে কাহাকে কখন কেন বলেছে?

৮। "মানুষের জাতটা চলে যায় কি করে সেইটে একবার দেখছিলুম।"—এ কথা কে কাহাকে কখন বলে?

৯। বিলে কে? তাঁহার বাবার নাম কি? বাবা কি করিতেন? তাঁহার বৈঠকখানায় কি টাঙানো থাকিত?

Theme

1. Castism is artificial

প্রথম স্বদেশী মামলা

—মিহির সেন

লেখক-পরিচয়। আধুনিক কথা-সাহিত্যিক মিহির সেন (জন্ম ১৯৩০) ছোটদের জন্য গদ্য রচনায়ও বিশেষ নিপুণতা দেখাইয়াছেন।

[**রচনা-পরিচয়।** বঙ্গদেশের বিপ্লবী আন্দোলন, অরবিন্দের ভূমিকা, চিত্তরঞ্জন দাশের মামলা-পরিচালনা—স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগের একটি ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে এই প্রবন্ধে।]

বিলেত থেকে দেশে এসে ব্যারিস্টারি শুরু করলেন চিত্তরঞ্জন।

কলকাতার আদালতে উকীল ব্যারিস্টারের যে রকম ভীড়, তাতে তাঁর মত নতুন কারো পসার জমানো ভীষণ কঠিন। তাই তিনি কলকাতার বাইরের আদালতে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।

একটা দুটো করে মক্কেল আসতে শুরু করল। কিছুটা নাম হল তাঁর। আরো কিছু মামলা এল এবার। আরো কিছু লোক নাম জানল। এমনি করে ধীরে ধীরে পসার জমে এল, বাড়তে লাগল আয় আর যশ।

এই সময় তাঁর হাতে এমন একটা মামলা এল যাতে চিত্তরঞ্জন রাতারাতি সারা দেশে পরিচিত হয়ে গেলেন। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম; মুখে মুখে তাঁর জয়-জয়কার।

ইতিহাসে সেই মামলার নাম—মুরারি পুকুরের বোমার মামলা। আদালতের ইতিহাসেও এ রকম গরম মামলার নজির খুব বেশি নেই।

এটাকে প্রথম স্বদেশী মামলাও বলেন অনেকে। এ মামলার একজন বড় আসামী ছিলেন ঋষি অরবিন্দ।

মামলাটা রাজনীতির সংগে জড়িত বলেই আমাদের দেশের তখনকার রাজনৈতিক ইতিহাস কিছুটা জানা দরকার।

গোটা দেশ জুড়ে তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বিদেশী সরকারের শাসন আর মানতে চাইছে না মানুষ। পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কংগ্রেসের পতাকার তলে দলে দলে মানুষ এসে জমা হচ্ছে। জাতীয় নেতাদের আদেশ মত পথে পথে আন্দোলন করছে।

কিন্তু আর এক দল তখন গোপনে তৈরী হচ্ছিল বিদেশী সরকারকে

গুলি-বোমা-বারুদ দিয়ে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য। দেশের তরুণরাই ছিল এ দলে সংখ্যায় বেশী। এদের নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ।

কিন্তু খুব বেশী দিন এ দল গোপন থাকল না। ছোটখাট কিছু ঘটনা এদিক ওদিক ঘটছিল, আচমকা একদিন বড় রকমের একটি ঘটনা ঘটে গেল মজঃফরপুরে। গোটা দেশ এ ঘটনায় চমকে উঠল।

মজঃফরপুরের একজন ইংরেজ উকিলের মেয়ে আর বউ একদিন সকালে গাড়ী করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁদের গাড়ীর উপর একটা বোমা এসে পড়ল। দুজনই মারা গেল তাতে। চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। পুলিশ অপরাধীকে ধরবার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ধরা পড়লেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভারের গুলিতে নিজের প্রাণ দিলেন। পুলিশ জানতে পারল, এঁদের আসলে মারার ইচ্ছে ছিল জজ কিংসফোর্ডকে। মহিলা দু'জন ভুলের শিকার হয়েছেন।

ইংরেজ শাসকরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাদের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যেমন করে হোক গোটা দলটাকে ধরতে হবে। এদের মূলসহ উপড়ে ফেলতে হবে।

পুলিশ খোঁজ করতে করতে মুরারি পুকুর রোডের একটা ঠিকানা পেল। আচমকা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা এই ঠিকানায়। এবং অবাক হয়ে দেখল এটা একটা গোপন বোমার কারখানা। অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়লেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং আরো অনেকে। এবং ঐ একই দিনে অন্য এক জায়গা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল অরবিন্দ ঘোষকে।

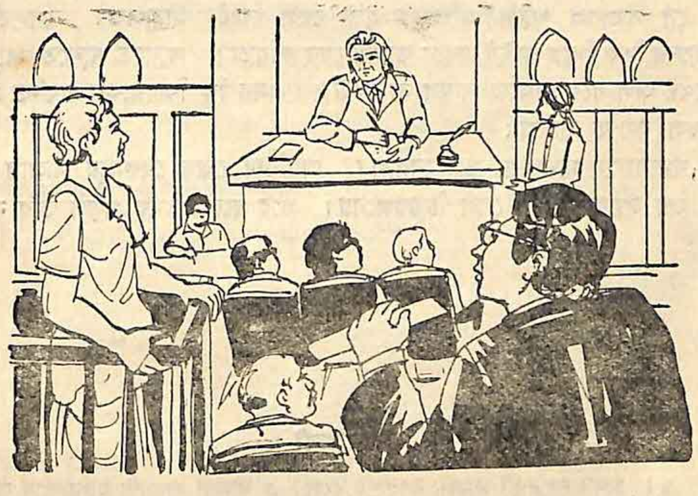
এর পর ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল ঘটনা। আসামীদের ভেতর নরেন গোঁসাই নামে একজন ভয়ে বেইমানী করল। রাজী হ'ল আদালতে সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে।

কিন্তু এই বেইমানী করার সুযোগ পেল না নরেন গোঁসাই। জেলের ভেতরই তার দলের দুজন, কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু গুলি করে হত্যা করলেন তাকে। গোটা দেশ আর একবার চমকে উঠল। বিচারে দুজনেরই ফাঁসি হল। আর তার আগেই মজঃফরপুরের খুনের জন্য ফাঁসি হয়ে গেছে ক্ষুদিরামের।

গোটা দেশ উত্তেজনায় থমথম করছে। বিদেশী সরকারের দাপটে কাঁপছে সারা দেশ।

এরই ভেতর শুরু হল মুরারিপুকুরের বোমার মামলা। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। দেশের এই বীর সন্তানদের কি বাঁচানো যাবে?

বড় বড় ব্যারিস্টারদের কাছে ছুটল দলের ছেলেরা। কিন্তু তাঁরা যে টাকা চাইলেন তাতে পিছিয়ে আসতে হল তাদের। এবার? অরবিন্দের সহোদরা সরোজিনী দেবী এবার ছুটে এলেন চিত্তরঞ্জনের কাছে। তখন সবে তাঁর পসার জমে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু অর্থের অভাব চলছে তখনও। তবু সরোজিনী দেবীর ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না। অরবিন্দের পক্ষে আদালতে এসে দাঁড়ালেন তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন। অর্থ নয়, যশ নয়—এলেন দেশের ডাকে।



শুরু হল সেই বিরাট মামলা। মাসের পর মাস চলল জেরা, জবানবন্দী, তর্কবিতর্ক। সবকিছু ভুলে মামলার অতলে ডুবে গেলেন চিত্তরঞ্জন। শুরু হল অমানুষিক পরিশ্রম। সারাদিন কাটত আদালতে। আর মাঝে মাঝে সারা রাত কেটে যেত মামলার কাগজপত্র দেখতে। মামলা তো নয়, যেন এক তপস্যায় বসেছেন। একমাত্র সাধনা, যেমন করে হোক দেশের এই বীর সন্তানদের বাঁচাতেই হবে।

এত বড় মামলা, কিন্তু নামমাত্র ফি। তাও অনিয়মিত হয়ে উঠল। তবু

অন্য কোন মামলা হাতে নিলেন না চিত্তরঞ্জন। পাছে আসল মামলায় মনোযোগ কমে যায়। তিনি অবিচল। যেমন করে হোক, দেশের এই বীর সন্তানদের বাঁচাতেই হবে।

অরবিন্দ নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন এই তরুণ তাপসকে। শুধু একদিন মুখ ফুটে বলেছিলেন, স্বয়ং নারায়ণ এসেছেন আমাকে বাঁচাতে।

পাঁচ মাস ধরে চলল সেই মামলা। গোটা দেশ অধীর হয়ে তাকিয়ে আছে শেষ ফলাফলের দিকে। কি হয় কে জানে।

অবশেষে মামলার শেষ দিন এল। মানুষের ভীড়ে ভরে গেল আদালত। তিল ফেলবার জায়গা নেই। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন। আসামীর পক্ষে শুরু করলেন তাঁর সওয়াল।

সে সওয়াল শুনে অভিভূত হয়ে গেল গোটা আদালত। সে ভাষণ আইনের দিক দিয়ে অটুট, ভাবে ভাষায় যেন কবিতা। শুনতে শুনতে আবেগে চোখের জল ধরে রাখতে পারল না কেউ। এমন কি বিচারকের পর্যন্ত চোখ ছলছল করতে লাগল।

যথাসময়ে মামলার রায় বেরুল। অরবিন্দ ঘোষ বেকসুর খালাস। জয় জয়কার পড়ে গেল চিত্তরঞ্জনের। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম।

অনুশীলনী

১। প্রথম স্বদেশী মামলা কাহাকে বলে? এ মামলা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

২। প্রথম স্বদেশী মামলার ব্যারিস্টার কে ছিলেন? তিনি কি তখন অন্য মামলাও করিতেছিলেন?

৩। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর কি হইয়াছিল? তাঁহারা কাহাকে মারিতে গিয়াছিলেন। তাহাকেই মারিয়াছিলেন কি?

৪। প্রথম স্বদেশী মামলার রায় কি হইয়াছিল?

৫। প্রথম দুইটি অনুচ্ছেদের ("বিলেত...শুরু করলেন।") ভাষা চলিত হইতে সাধুতে পরিবর্তিত কর।

৬। শব্দার্থ লেখঃ—সওয়াল, ছলছল, বেকসুর, বেইমানী, উত্তেজনা, থমথম, পসার, সহোদরা, জবানবন্দী, তর্কবিতর্ক।

৭। বাক্য রচনা করঃ—মামলা, বিচারক, অমানুষিক, অনিয়মিত, আদালত, পরাধীনতা।

৮। মজঃফরপুরের বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কে কে যুক্ত ছিলেন? কাহারা নিহত হইল? বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কি? বিপ্লবীদের কি পরিণাম ঘটিল?

৯। মুরারি পুকুরে হানা দিয়া পুলিশ কি পাইল? কাহাদের গ্রেপ্তার করিল? ইহাদের দলপতি কে ছিলেন? নরেন গোঁসাই কে? তাহার পরিণাম কি হইল?

১০। মুরারি পুকুরের বোমার মামলায় আসামী পক্ষের উকিল কে ছিলেন? তিনি কিভাবে মামলাটি পরিচালনা করিয়াছিলেন?

১১। মুরারি পুকুরের দলের বিশ্বাসঘাতক কে? তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল? তাহার শাস্তিদাতাদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল?

Theme

1. Love for freedom
2. Revolutionary movement



জেম্‌স্ ওয়াট্ এবং তাঁর আবিষ্কার

—জলধর সেন

লেখক-পরিচয়। জলধর সেন (১৮৬০—১৯৩৯) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ভ্রমণ কাহিনী রচয়িতা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিয়াছিলেন।

[**রচনা-পরিচয়।** জলীয় বাষ্পের শক্তিকে যে কাজে লাগানো যায় এই সত্য আবিষ্কার করিয়া জেম্‌স্ ওয়াট্ অমর হইয়া আছেন। তাঁহার বাল্যকালের অভিজ্ঞতার গল্প এখানে বলা হইয়াছে—আর বলা হইয়াছে পরবর্তী আবিষ্কারের কথা।]

উননে ভাত ফুটছিল, আর হাঁড়ির মধ্য থেকে ধোঁয়া উঠছিল; তাই দেখে মহেন্দ্র প্রশ্ন করল, হাঁড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া উঠছে কেন?

বাবা উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, তুমি অবশ্যই দেখেছ, ভাত রাঁধবার হাঁড়িতে চাল আর জল দিয়ে উননে চড়িয়ে দেওয়া হয়। উনন তখন জ্বলতে থাকে। ঐ যে জল দেখছ, আগুনের তাপ লাগলে ঐ জল গরম হয়। আগুনের আঁচ লাগলে যে গরম বোধ হয়, এ কথার উপর ত আর 'কেন' নেই, কারণ তুমি ত তা দেখতেই পাও। তেমনই হাঁড়িতে জল দিয়ে জ্বাল দিলে জল গরম হয়। আর গরম হ'লে জল ফুটে ওঠে, আর তার থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে। ওকে ধোঁয়া বলে না, ওর নাম বাষ্প। জলে উত্তাপ লাগলেই সে জল গরম হয়ে বাষ্প হ'তে থাকে, আর সেই বাষ্প উঠে বাতাসে মিলিয়ে যায়। এটা জলের ধর্ম।

জল যদি অমন করে বাষ্প হ'য়ে উড়ে না যেত, তা হ'লে এই যে এমন পৃথিবী দেখছ, এই যে গাছপালা দেখছ, এই যে ফুলফল দেখছ, এই যে ক্ষেতে শস্য দেখছ, এ সব কিছুই থাকত না। সমুদ্রে অনেক জল আছে, পুকুরে কত জল আছে। বর্ষার সময় পুকুর জলে ভ'রে যায়, আবার গ্রীষ্মের সময় জল শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে যায় কোথায়? ঐ যে সূর্য দেখছ ওরই তাপে সমুদ্রের ও পুকুরের জল গরম হয়ে বাষ্প রূপে আকাশে উঠে যায়। সেই বাষ্প থেকে আকাশে মেঘ হয়, আর সেই মেঘ থেকে আবার ঠাণ্ডা লেগে বৃষ্টি হয়, সেই

বাষ্প মেঘ হয়ে শেষে জলরূপে আবার পৃথিবীতে নেমে আসে। আর সেই বৃষ্টির জল পেয়ে শস্য হয়, গাছে ফল হয়, পৃথিবীর এত শোভা হয়, পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়।

কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য বোধ করবে, মহেন্দ্র, যে ঐ ভাতের হাঁড়ির ধোঁয়া বা বাষ্প দেখে তোমারই মত আর একটি ছেলে এই পৃথিবীতে কি আশ্চর্য কাণ্ড করে গিয়েছেন। বিলেতে অনেকদিন আগে তোমারই মত একটি ছেলে জন্মেছিল। তাঁর নাম জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌। সেই ছেলেটি একদিন রান্নাঘরে গিয়ে দেখল যে, উননের উপর তার খুড়িমা এক হাঁড়ি জল চাপিয়ে দিয়েছেন; আর সেই হাঁড়ির উপর একটি ঢাকনি চাপা দেওয়া আছে। জল তখন গরম হয়েছে। তুমি যেমন আজ দেখলে যে হাঁড়ির মধ্য থেকে ধোঁয়া বা বাষ্প উঠছে, ওয়াট্‌ দেখল যে হাঁড়ির মধ্যে জল গরম হয়ে যে বাষ্প হয়েছে, সেই বাষ্প উপরের ঢাকনিটাকে ক্রমাগত ঠেল্‌ছে; আর সেই ঠেলা পেয়ে ঢাক্‌নিটা এক একবার লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। তোমাদের আজকের ভাতের হাঁড়ির উপর যদি সরা চাপা থাক্‌ত, তাহ'লে তুমিও দেখতে পেতে যে, সরাটা হাঁড়ির মুখের উপর নড়ছে; অর্থাৎ বাষ্পের এমন জোর হচ্ছে যে, সে সরাটাকে ঠেলে ফেলে দিতে চাচ্ছে।

জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌ এই দেখে অবাক হয়ে গেল। এ ব্যাপার ত সকলেই দেখে; কিন্তু ঐ ছেলেটা যে চোখ দিয়ে দেখল, তেমন করে আর ত কেউ দেখে নাই। ছেলেটা তখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করল, এ কি? এ কেন হয়? সে রোজই উননে জল গরম হবার সময় বসে বসে ঐ বাষ্প দেখত, আর ভাবত। তার খুড়িমা তাকে বকতেন, বলতেন, 'ও তুই কি একমনে দেখিস্‌ বাবা! শেষে কি পাগল হয়ে যাবি?'

সত্যিই ছেলেটির মাথার ভিতরে ঐ গরম জলের হাঁড়িই খেলা করতে লাগল। তারপরে কি হলো জান? ঐ ছোট ছেলে জেম্‌স্‌ ওয়াট্‌ শেষে বড় হয়ে এক প্রকাণ্ড আবিষ্কার করে ফেলল। বাষ্পের যে কত বড় শক্তি, তা সেই ছেলেবেলায়ই জলের হাঁড়িতে দেখেছিল। তারই ফলে সে জলের সেই বাষ্পকে এমন কাজে লাগিয়ে দিল যে, তার ফলে তোমাদের এই সব গাড়ীর ইঞ্জিন চলছে, জাহাজ চলছে। আরও কত কি হচ্ছে। জল গরম করে, বাষ্প করে, তারই জোরে এই সব কলকারখানা চলছে।

এই যে প্রকাণ্ড আবিষ্কার, তার মূলই হচ্ছে সেই বালক ওয়াটের সেই গরম জলের হাঁড়ির মুখের ঢাক্‌নির ওঠা-নামা, অর্থাৎ যাকে আজ তুমি ধোঁয়া

বললে, তারই শক্তির খেলা। সে দেখতে পেয়েছিল, তাই এমন ব্যাপার হ'য়ে গেল; সে ঐ দেখে 'কেন এমন হয়' তাই ভাবতে আরম্ভ করেছিল, তাই এমন একটা আবিষ্কার হ'য়ে গেল।

তোমাকে আশীর্বাদ করছি মহেন্দ্র, তুমিও জেম্‌স্ ওয়াটের মত দেখতে শেখ, সব তাতেই 'কেন' বলে অনুসন্ধান করতে শেখ। কে বলতে পারে, তুমিও একদিন জেম্‌স্ ওয়াটের মত একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করে ফেলবে না!

অনুশীলনী

১। জেমস্ ওয়াট্ কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন? কিভাবে এই আবিষ্কারের কথা তাঁহার মনে আসে?

২। জলের ধর্ম কি? জলের এই ধর্ম কিভাবে পৃথিবীর উপকার করে?

৩। নিচের অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করঃ—

তুমিও জেম্‌স্ ওয়াটের মত......ফেলবে না।

৪। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা করঃ—

অনুসন্ধান, প্রকাণ্ড, আবিষ্কার, আঁচ, ক্রমাগত।

৫। উনানের ভাতের হাঁড়ি হইতে ধোঁয়া বাহির হয় কেন? জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়—পৃথিবীর পক্ষে ইহা কেন এবং কিভাবে প্রয়োজনীয়?

৬। কিভাবে মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়? বৃষ্টি না হইলে কি হইত?

৭। জেমস্ ওয়াট্ রান্নাঘরে গিয়া কি দেখিল? বাষ্পের যে জোর আছে তাহা সে কিভাবে বুঝিতে পারিল?

৮। বাষ্পের জোরকে কাজে লাগাইয়া আধুনিক কালে কি করা হয়?

ভক্তের ভগবান শ্রীচৈতন্য

[রচনা-পরিচয়। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।]

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার দিনে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নিমাই বা গৌরাঙ্গ নামে বাল্যকালে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। নিমাইয়ের এক বড় ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম বিশ্বরূপ। টোলে লেখাপড়া করিয়া তিনি পরে সন্ন্যাসী হইয়া যান।

শৈশব ও কৈশোরে নিমাই ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত। বাড়ির আত্মীয়-স্বজন গোটা নবদ্বীপবাসী তাঁহার দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে তাঁহার অনেক জ্ঞান হইল। তখনও কিন্তু তাঁহার দুরন্তপনা কমে নাই। অবশেষে পাঠ সমাপ্ত করিয়া নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক হিসাবে জীবন শুরু করিলেন।

নিমাই নিজের টোল খুলিলেন। তরুণ অধ্যাপকের খ্যাতি অল্পকালের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় কেশব-কাশ্মীরী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসেন। প্রবীণ পণ্ডিতেরা যখন ভীত, তরুণ অধ্যাপক নিমাই অসীম সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর ছড়াইয়া পড়িল।

ক্রমে সংসার সম্বন্ধে তিনি কতকটা উদাসীন হইয়া পড়িলেন। পিতার পিণ্ডদানের জন্য তিনি গয়া-তীর্থে গমন করিলেন। গয়া গিয়াই নিমাইয়ের ভাবান্তর আরম্ভ হইল। তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে গোপালমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন। ক্রমে নিমাইয়ের মধ্যে ভক্তিভাবের প্রবলতা দেখা দিল।

নিমাই নবদ্বীপে আসিলেন। তখন তিনি গৃহী, কিন্তু সে নামে মাত্র। জ্ঞানচর্চায়, তর্কবিতর্কে, পাণ্ডিত্যে তাঁহার আর মন নাই। তিনি অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে নামসংকীর্তন করিয়া বেড়ান। নিমাই বলিলেন, "হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" বলিলেন, "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে মোর ঠাকুর।" তাঁহার বাণীতে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়া গেল, ভক্তির আবেগে সমাজের নীচের স্তরের মানুষও মহিমা লাভ করিল। তিনি যবন হরিদাসকে প্রধান ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করিলেন। হরিদাসের বৈষ্ণব মত গ্রহণ বড় সোজা ব্যাপার ছিল না। অনেক অত্যাচার ও

প্রলোভন জয় করিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। নিমাই বিপথগামী জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি সর্বস্তরের সাধারণ বৈষ্ণবভক্তকে লইয়া নবদ্বীপে নগরসঙ্কীর্তনে বাহির হইতেন। এটিও একেবারে নূতন ধরনের ব্যাপার।

তাঁহার নূতন ধর্ম, নূতন মতামত প্রাচীনপন্থীদের পছন্দ হইল না। তাঁহারা নবদ্বীপের কাজীর কাছে নালিশ করিলেন। কাজী নবদ্বীপে নাম-কীর্তন নিষিদ্ধ করিলেন। নিমাই এই নিষেধ শুনিলেন না। তিনি ভক্তদের বিরাট এক দল লইয়া নগর-কীর্তনে বাহির হইলেন। জনশক্তির কাছে কাজী আত্মসমর্পণ করিলেন। কীর্তনের উপর হইতে তিনি নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নিলেন।

নিমাই চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসের দীক্ষা নিলেন। তার পর তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নৌকাপথে পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরে তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। চৈতন্য তাঁহার বৈপ্লবিক ধর্মীয় মত লইয়া মুসলমান রাজত্বে বাস করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। পুরীর হিন্দুরাজ্যে তিনি আশ্রয় নিলেন।

এই সময় হইতে শ্রীচৈতন্য প্রধানত পুরীতেই বাস করিতে থাকেন।

পুরী হইতে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন এবং ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। ভারত ভ্রমণ করিয়া শেষ আঠারো বৎসর শ্রীচৈতন্য পুরীতেই ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি প্রায়ই দিব্যভাবে থাকিতেন। প্রায়ই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। তিনি সর্বদা 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতেন, কখনও অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। পুরীতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাঁহারা ভক্ত নন তাঁহারাও চৈতন্যদেবকে জাতীয় জীবনের এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। বাঙালীর জীবনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

অনুশীলনী

১। চৈতন্য কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
২। তাঁহার বাল্যকালের নাম কি ছিল?

৩। তাঁহার পিতার নাম কি? মাতার নাম কি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কি?
৪। নিমাই পড়া শেষ করিয়া কি কাজ আরম্ভ করেন?
৫। তিনি তর্কযুদ্ধে কাহাকে পরাস্ত করেন?
৬। শ্রীচৈতন্যের প্রধান কয়েকজন শিষ্যের নাম কর।
৭। কাজীর সঙ্গে তাঁহার বিবাদ হইল কেন? বিবাদের ফলে কি হইল?
৮। শ্রীচৈতন্যের পুরীর জীবনধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৯। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা করঃ—বাহ্যজ্ঞান, ক্রন্দন, অজ্ঞান, মহাপুরুষ, সন্ন্যাসী, অত্যাচার, প্রলোভন, দিব্যভাব, নিষেধাজ্ঞা।
১০। সন্ধিবিচ্ছেদ করঃ—নিষেধাজ্ঞা, ভাবান্তর, দিগ্বিজয়ী, জগন্নাথ, অদ্বৈতাচার্য।

Theme

1 Life of Sri Chaitanya
2. A religious movement — naturally faced serious opposition from the fanatic section of the caste hindus and the non hindus

সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়

—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচয়।** ঐতিহাসিক ও গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ (১৮৯১—১৯৫২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একজন কর্ণধার ছিলেন। তাঁহার লেখায় নির্ভুল তথ্য ও বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়।

[**রচনা-পরিচয়।** রামমোহন নতুন সমাজ গঠনে নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তিনিই আধুনিক কালের প্রধান মানুষ। এই প্রবন্ধে তাঁহার কয়েকটি কার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।]

ভাল করিয়া ইংরেজী শেখায় এবং ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করায় একদিকে রামমোহনের যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, আর একদিকে তেমনই সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের ইচ্ছাও প্রবল হয়।

নূতন ধর্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনের একদিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের সহিত বিরোধ আরম্ভ হইল, আর একদিকে তেমনই গোঁড়া পাদরি-দের সহিতও তর্কবিতর্ক বাঁধিল।

তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি নূতন সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট। ইহার নামকরণ হয় "ব্রাহ্মসমাজ"। সে সময়ে লোকে এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলিত।



রামমোহন যখন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এদেশে সহমরণ প্রথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ও যাহাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। মোগল-সম্রাট আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন।

ইংরেজশাসন স্থাপিত হওয়া অবধি মিশনারীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। ইংরেজ শাসকদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেসলী প্রথমে এই প্রথা সংযমিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে

নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কিনা, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

রামমোহন কলিকাতা আসার অল্পদিন পর হইতেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করেন যে, বিধবাদিগকে স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে হইবে, এমন কোন নির্দেশ নাই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই প্রথা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধ হইলে হিন্দুধর্ম লোপ পাইবে, এই কথা বলিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের মত প্রচার করিবার জন্য ধর্মসভা বলিয়া একটি সভা করিলেন।

সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন্য রামমোহনের একমাত্র কল্যাণকর কাজ নহে। নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তাহারা যাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে বিষয়েও রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন।

Theme
Social reform — banning Sati rite

অনুশীলনী

১। রামমোহনের সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ইচ্ছা হইয়াছিল কেন?

২। রামমোহন যে ধর্ম প্রচার করেন তাহার নাম কি? তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমাজের নাম কি?

৩। সহমরণ প্রথা কি? রামমোহন কেন এই প্রথার বিরোধী ছিলেন? তিনি কিভাবে এই প্রথা রহিত করার চেষ্টা করেন?

৪। রামমোহন ছাড়া আর কে কে সহমরণ প্রথা দূর করার চেষ্টা করেন?

৫। সহমরণ প্রথা কবে কাহার দ্বারা নিষিদ্ধ হইল?

৬। রামমোহন সমাজ-সংস্কারের জন্য কি কি কাজ করেন?

৭। ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া রামমোহনের সহিত কাহাদের বিবাদ হয়?

৮। শব্দার্থ লেখঃ—অধ্যয়ন, ধর্মসংস্কার, রক্ষণশীল, পরামর্শ, তর্কবিতর্ক, আন্দোলন, কল্যাণকর।

৯। "নারী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল।"—এখানে ব্যবহৃত বিশেষণ পদগুলি বুঝাইয়া দাও।

১০। দ্বারকানাথ, লর্ড ওয়েলেসলি, বেণ্টিঙ্ক, আকবর—বর্তমান প্রবন্ধে ইঁহাদের প্রসঙ্গে কি বলা হইয়াছে?

মহাবীর অভিমন্যু

—কাশীরাম দাস

কবি-পরিচয়। বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল কমলাকান্ত। কবির পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সিঙ্গি বা সিঙ্গি গ্রামে। কাশীরামের কাব্য সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে লেখা হয়। কবি মহাভারত রচনা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

[**রচনা-পরিচয়।** অর্জুনের বালক পুত্র অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহার বিবরণ।]

ব্যূহ প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর।
ভীম আদি যোদ্ধা সব হইল অস্থির॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।
চিন্তাকুল হৈল বড় পড়িল বিপদ॥



হোথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ।
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল বিনাশ॥
সাহস করিল তবু অভিমন্যু বীর।
বাণ-বৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির॥

একা রণে অভিমন্যু করে মহামার।
দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যচয়।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষাপক্ষী রয়॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।
মীন যেন পড়ে হায় হয়ে জালে বন্দী॥
তথাপি অভয় ধনু হাতেতে লইয়া।
একা রথে ভ্রমে সৈন্য শাসিত করিয়া॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায়॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে তুরঙ্গ বহুত।
কোটি কোটি সৈন্য মারে সংগ্রামে অদ্ভুত॥
অলস না হয় তবু সাহসী বালক।
সৈন্যারণ্য দহে যেন হইয়া পাবক॥
প্রকাশে বিক্রম যত নাহি তার সীমা।
বাখানয়ে বালকের বিবিধ মহিমা॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চবাণ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণে।
চিন্তাকুল দুর্যোধন বিষণ্ণ বদনে॥

৭

অনুশীলনী

১। অভিমন্যু কে ছিলেন? কাহাদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন? কেন এই যুদ্ধ?

২। এই কবিতায় অভিমন্যুর বীরত্বের কি পরিচয় আছে?

৩। 'নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।'
'না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।'
এই বাক্য দুইটির আসল মানে বুঝাইয়া বল।

৪। কোন্ রচনা হইতে গৃহীত? কাহার লেখা? প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা কর:—(ক) চৌদিকে বেষ্টিত......জালে বন্দী।

(খ) জলদ বরিষে......ক্ষমা নাহি তার॥

৫। শব্দার্থ লিখ:—ব্যূহ, চমৎকার, সৈন্যচয়, পিঞ্জর, জলদ, মাতঙ্গ, রঙ্গ, পাবক, বাখানয়ে, বিষণ্ণ।

৬। বাক্য রচনা কর:—বন্দী; সৈন্য; ক্ষমা; সংগ্রাম অদ্ভুত, সন্ধান, সাহসী, বিক্রম।

৭। "চৌদিকে বেষ্টিত......শাসিত করিয়া"—এই অংশটুকুর গদ্যরূপ লেখ।

৮। অভিমন্যু কোন্ ব্যূহে ঢুকিয়াছিল? "ভীম আদি যোদ্ধা সব হইল অস্থির॥"—কেন?

৯। "পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষা পক্ষী রয়।" কাহার সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে? কেন, বুঝাইয়া দাও।

১০। "চিন্তাকুল দুর্যোধন বিষণ্ণ বদনে।" দুর্যোধন কে, তাঁহার এইরূপ "চিন্তাকুল" অবস্থা হইল কেন?

Theme
heroism of Abhimanyu

বঙ্গভাষা

- মধুসূদন দত্ত

কবি-পরিচয়। কবি মধুসূদন দত্ত যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। পিতা অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। মধুসূদন পিতার একমাত্র পুত্র। শৈশব হইতেই পিতা-মাতার আদরে খেয়ালী ও জেদী হইয়া উঠেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে তিনি ও তাঁর বন্ধুবর্গ সচেতন ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্র ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার বিরাগভাজন হন। প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনায় ব্রতী হন, পরে সুহৃদবর্গের অনুরোধে মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করেন। তাঁর স্বল্পকালব্যাপী কাব্যজীবনে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে নব রূপ দান করেন। তাঁর বহুমুখী কৃতিত্বের মধ্যে বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন—চতুর্দশপদী কবিতা রচনা এবং সার্থক নাটক ও প্রহসন রচনা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, এবং নাটক ও প্রহসনের মধ্যে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

[**রচনা-পরিচয়।** মাতৃভাষার প্রতি কবির শ্রদ্ধা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।]

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

অনুশীলনী

১। কবি এখানে "ভিক্ষাবৃত্তি" বলিতে কি বুঝাইয়াছেন?

২। কবি "পরধন লোভে মত্ত" হইয়া কি করিয়াছিলেন?

৩। স্বপ্নে কে কবিকে কি বলিয়াছিলেন? কবি তখন কি করিলেন? তাহার ফল কি হইল?

৪। এই কবিতার মূল ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত কর।

৫। কাহার লেখা কোন্ কবিতা হইতে এই অংশ গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা কর—(ক) অনিদ্রায়...কমল-কানন।

(খ) পালিলাম আজ্ঞা...পূর্ণ মণিজালে।

৬। শব্দার্থ লেখ—বিবিধ, রতন, ভিক্ষাবৃত্তি, পরিহরি, নিরাহারে, সঁপি, বিফল তপে, অবরণ্যে, কেলিনু, মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

৭। কবি বিদেশী ভাষাকে কিসের কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন? উপমাগুলি বুঝাইয়া দাও।

৮। কবি মাতৃভাষাকে কিসের কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন? উপমাগুলি বুঝাইয়া দাও।

৯। প্রথম পাঁচ চরণের গদ্যরূপ লেখ।

Theme

1. Love for mother land — mother tongue
2. A foreign language cannot properly nurture ~~poetic~~ talent of a poet

সিদ্ধার্থ ও দেবদত্ত

—নবীনচন্দ্র সেন

কবি-পরিচয়। নবীনচন্দ্র (১৮৪৭—১৯০৯) বাংলা কাব্যে মধুসূদনের অনুসরণ করেন। "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি মহাকাব্য তাঁর লেখা। তিনি "পলাশীর যুদ্ধ" প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া জনপ্রিয় হন।

[**রচনা-পরিচয়।** অল্পবয়স হইতেই সিদ্ধার্থ (পরে বুদ্ধদেব) মহাপুরুষের নানা গুণের পরিচয় দিয়াছেন। এই গল্পে তাহার নিদর্শন আছে।]

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমন
শুভ্র মেঘখণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দলহরীপূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে ; হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শরে লাগিল কোমল করে,
কুমার প্রথম এই বুঝিল বেদন ;
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে
হইল বিগত ব্যথা বাঁচিল মরাল ;
কুমার লইয়া বুকে মুগ্ধা জননীর মত,
চাহি' ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।
কি মহিমা করুণার কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান ;
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ।
আসি' দেবদত্ত কহে— "কুমার, এ হংস মম,
মম শরে হয়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিল ধীরে, "হত জীব হত্যাকারী
পায় যদি, ভাই, কোন্ ধর্মশাস্ত্র বলে,

যে দেয় জীবন তা'রে সে কি তারে পাইবে না?
হত নহে, এই হংস আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই, আজ বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।



তোমারো তো আছে প্রাণ পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম?
লও তুমি শাক্য-রাজ্য,— আমি নাহি চাহি তাহা—
এ হংস আমার, আমি দিব না কখন।"
শাক্য-পুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত বিস্মিতচিত্ত,
দেখিল—কুমার নহে, মূর্তি করুণার।
ফিরিল নীরবে গৃহে, উড়িল মরাল সুখে
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

অনুশীলনী

১। এই কবিতার গল্পটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বল।

২। রাজহংসটিকে কে তীর মারিয়াছিল? কে বাঁচাইয়াছিল? তাঁহাদের দুইজনের কাহার কেমন স্বভাব দু'কথায় বল।

৩। কাহার লেখা কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া উদ্ধৃত অংশগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

(ক) উদ্ধার করিতে শরে......পুণ্যপ্রস্রবণ।

(খ) কি মহিমা করুণার......বিমোহিত প্রাণ।

(গ) হত জীব হত্যাকারী......পাইবে না?

৪। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা করঃ—মনোহর, মেঘখণ্ড, গগন, উদ্ধার, অধীর, জননী, মহিমা, কানন, বিহঙ্গ, বিমোহিত, হত্যাকারী, স্তম্ভিত।

৫। "একদিন নিরজনে......প্রস্রবণ"—এই অংশটুকুর গদ্যরূপ লেখ।

৬। সিদ্ধার্থ কে? পরবর্তী সময়ে তাঁহার কি নাম হয়? তিনি কোন্ ধর্ম প্রচার করেন?

৭। সন্ধিবিচ্ছেদ করঃ—পুরোদ্যান।

৮। "কুমার, এ হংস মম।"—একথা কে কাহাকে বলে? কি প্রসঙ্গে বলে? কুমার কে? তিনি এই কথার উত্তরে কি বলিলেন?

৯। "হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।" কে এই কথা বলে? কেন বলে? তাঁহার মনের কি পরিচয় ইহার মধ্য হইতে পাওয়া যায়?

১০। "উড়িল মরাল সুখে কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।" মরাল কি? তাহারা কাহার কি ধরনের করুণার কথা প্রচার করিল?

Theme

1. Human Values
2. Love for animals — love and affection wins over cruelty

মূল্যপ্রাপ্তি

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রচনা-পরিচয়। এই কবিতায় একটি গল্প বলা হইয়াছে। কিভাবে সুদাস মালী বুঝিতে পারিল ধর্ম শান্তি করুণা সামান্য টাকা-পয়সার চাইতে অনেক বড় তাহাই এখানে বর্ণিত।]

অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কী করিয়া।

তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদদ্বারে
মাগিল রাজার দরশন—
হেনকালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল এক জন,

'অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার?
বুদ্ধ ভগবান্ আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'

মালী কহে, 'এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে—
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে

রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধ দরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, 'কত মূল?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।'

মালী কহে, 'হে রাজন স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।'

'দশ মাষা দিব আমি' কহিলা ধরণীস্বামী,
'বিশ মাষা দিব' পান্থ কয়।

দোঁহে কহে 'দেহো দেহো', হার নাহি মানে কেহ—
ম্ল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।

মালী ভাবে যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আর পাব কত!

কহিল সে করজোড়ে, 'দয়া করে ক্ষম মোরে—
এ ফ্ল বেচিতে নাহি মন।'

এত বলি ছ্টিল সে যেথা রয়েছেন বসে
ব্দ্ধদেব উজলি কানন।

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দম্রতি।

দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফ্রিছে অধর 'পরে
কর্ণার স্ধাহাস্যজ্যোতি।

স্দাস রহিল চাহি— নয়নে নিমেষ নাহি,
ম্খে তার বাক্য নাহি সরে।

সহসা ভূতলে পড়ি, পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম 'পরে

বরষি অমৃতরাশি ব্দ্ধ শ্ধালেন হাসি,
'কহ বৎস, কী তব প্রার্থনা।'

ব্যাকুল স্দাস কহে, 'প্রভু, আর কিছ্ নহে,
চরণের ধ্লি এক কণা।'

অনুশীলনী

১। এই কবিতার গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

২। মালী কেন পদ্মটি বিক্রয় করিল না?

৩। প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করঃ—ব্যাকুল সুদাস কহে...ধূলি এক কণা।

৪। "প্রভু আর কিছু নহে, চরণের ধূলি এক কণা।" কে কাহাকে কখন এই কথা বলে? কেন বলে? বক্তব্যের তাৎপর্য কি?

৫। মালী কাহাকেও ফুলটি বেচিল না কেন? সে পদ্মটি লইয়া কি করিল?

৬। পদ্মটি কিনিবার জন্য রাজা ও পথিকের মধ্যে কিরূপ প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল? প্রতিযোগিতা দেখিয়া মালী কি করিল?

৭। শব্দার্থ লেখঃ—নিষ্ঠুর, হেনকালে, পুরমাঝ, পান্থ, ধরণীস্বামী, মালী, সুধাহাস্যজ্যোতি।

৯। বাক্য রচনা করঃ—কানন, সরোবর, প্রসন্ন, প্রশান্ত, নয়ন, ব্যাকুল, বিবাদ।

৮। প্রথম দশটি চরণের গদ্যরূপ লেখ।

Theme

1. Spiritual attainment is the best attainment
2. It can be attained not by cash or kind but by selfless devotion

কাগজের নৌকা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রচনা-পরিচয়। একটি কল্পনাপ্রবণ বালক খেলাচ্ছলে কাগজ-নৌকা তৈয়ারী করিয়া ভাসায়। এই প্রসঙ্গে তাহার মনের ভাবনার যে ঢেউগুলি ওঠে-পড়ে কবিতাটিতে তাহার মনোরম বর্ণনা আছে]

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি।
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম
বড়ো বড়ো করে মোটা অক্ষরে,
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর-কোনো দেশে
আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি।



আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি তীরে।

ছোটো ছোটো ঢেউ ওঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি চলে যায় ডাকি,
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোটো নৌকার মতো—
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে।
ঐ মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে।

রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে—
চোখ বুজে ভাবি—এমন আঁধার,
কালী দিয়ে ঢালা নদীর দুধারে,
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে।
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি।
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুমপাড়ানিয়া মাসি।

অনুশীলনী

১। ছোটো ছেলেটি কাগজের নৌকায় নাম ঠিকানা লিখিয়া দেয় কেন?
২। কাগজের নৌকাটি কিভাবে ভাসিয়া চলে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩। রাতে ছোট ছেলেটি শুইয়া কি ভাবিতেছিল?

৪। প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করঃ—
(ক) ঐ মেঘ আর......কাহার আগে।
(খ) ঘুম লয়ে সাথে......মাসি।
৫। দ্বিতীয় স্তবকটি গদ্যে লেখ।
৬। বাক্য রচনা কর—তরণী, গগন, রবি, ঝিকিমিকি।
৭। নিচের পদগুলির পরিচয় লেখ—
যতনে, মেঘ, ছোটো, আঁধার, বিছানা।
৮। ছুটি হইলে বালকটি কি খেলা খেলে?
৯। নৌকাটি ভাসাইয়া সে কি করে? সে তাহার নৌকার সঙ্গে কিসের তুলনা দিয়াছে?
১০। "ঘুম লয়ে সাথে...মাসি।" কোন্ প্রসঙ্গে কে এই কথা বলিয়াছে? তাহার এইরূপ ভাবিবার কারণ কি?

Theme

1. Love for nature
2. imagination of child

দেশের মাটি

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি-পরিচয়ঃ সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯২২) ছিলেন রবীন্দ্রযুগের খুব জনপ্রিয় কবি। তিনি নানা ছন্দে অপরূপ সব কবিতা লিখিতেন। তাঁর কবিতায় একদিকে হাল্কা-মেজাজের নানা রচনা আছে—অন্যদিকে আছে স্বাধীনতার জন্য গভীর ব্যাকুলতা। পুরাণ-ইতিহাসের বিবিধ কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন।

[**রচনা-পরিচয়।** কবি মাতৃভূমির প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বন্দনা করিয়াছেন এই কবিতায়।]

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি

চন্দনেরি গন্ধ-ভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি।

শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি।

নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর যে তার ধোয়ায় পা'টি।

মউল ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পায়জোরে তার লবঙ্গফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।

নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী যোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে,
আটটি শীষে বাঁধা আটি।

সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

অনুশীলনী

১। কবি দেশের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় লেখ।

২। কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত? কাহার লেখা? প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করঃ

(ক) চন্দনেরি গন্ধ-ভরা......শীতল পাটি।
(খ) শিয়রে তার সূর্য......রূপার কাঠি!
(গ) নাগের বাঘের......ধোয়ায় পা'টি।
(ঘ) সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি......কান্নাকাটি।

৩। এ কবিতা কোন্ দেশ নিয়া লেখা? সে দেশে কি চন্দন জন্মায়? লবঙ্গ? কবি এ রকম লিখিলেন কেন?

৪। নিচের শব্দগুলির অর্থ ও ব্যবহার লেখ—নীল-পদ্ম-আঁখি, বার্তা, কনক, পায়জোর, অন্নপানী, নিদ্‌মহল।

৫। গদ্যে রূপান্তরিত করঃ—“মধুর চেয়েও আছে মধুর...শীতল-পাটি।”

৬। বঙ্গভূমির যে রূপের কথা কবি বলিয়াছেন তাহার কতগুলি বাস্তব, কতগুলি কাল্পনিক। কোন্‌গুলি কোন্ শ্রেণীর বল।

Home

1. Praise for mother land

গ্রামের পথে

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কবি-পরিচয়ঃ কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০) ছিলেন বাংলার পল্লীর কবি। পল্লীগ্রামের সরল সাধারণ ছবি ও মানুষ তাঁর বুকের অনেকখানি ভালোবাসা নিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁর রচনায়। তাঁর কবিতার ভাষাও খুব সরল আর স্পষ্ট। একটা গভীর আন্তরিকতা তাঁর সব লেখায় পাওয়া যায়।

[**রচনা-পরিচয়**। কবি নিজের গ্রামের সব কিছু—এমন কি তুচ্ছ ধূলি-কণার প্রতিও গভীর মমতা অনুভব করিয়াছেন।]

আমার গ্রামের পথে আমার ঘুরে বেড়ায় মন
যেমন নদীর ঢেউয়ে নাচে প্রভাত সমীরণ
পরিচিত পথের গাছে
কি মমতাই মাখা আছে,
ঘাসের ছোট ফুলটি যেন করছে আলাপন।

এমন শ্যামল এমন কোমল লতা কোথায় আর?
ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে শীর্ণ-তনু তার।
কি যেন এ পথের ধূলি,
করলে নরম সোহাগ গুলি,
সূর্য-করে পাই যেন তার করের পরশন।

ফিরে যদি জন্মাতে হয়, এই করুণা চাই—
এই গ্রামেতেই দিও দয়াল ফিরে আমার ঠাঁই।
দেবালয়ের এ অঙ্গনে
আসব আবার শুভক্ষণে,
তুচ্ছ করি' ইন্দ্রপুরী নন্দন-কানন।

অনুশীলনী

১। কবির গ্রামটির যে বর্ণনা এই কবিতায় আছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'গ্রামের পথে' কবিতায় নিজের গ্রামের জন্য কবির যে ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার পরিচয় দাও।

৩। কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত? কাহার লেখা? প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করঃ—ফিরে যদি জন্মাতে হয়,...নন্দন-কানন।

৪। নিচের শব্দগুলির অর্থ লেখঃ

প্রভাত-সমীরণ, শীর্ণ, সোহাগ, আলাপন, সূর্য-কর, ইন্দ্রপুরী, নন্দন-কানন।

৫। নিচের পদগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ না ক্রিয়া?

পরিচিত, শ্যামল, নরম, কোমল, লতা, করছে।

৬। গ্রামের পথের গাছ, ঘাসের ফুল—ইহাদের সঙ্গে কবির কি সম্পর্ক? এখানকার পথের ধূলি এত নরম হইল কিসে? সূর্যরশ্মিতে কবি কিসের স্পর্শ পান?

৭। "দেবালয়ের এ অঙ্গন" বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? পুনর্জন্ম পাইলে কবি কোথায় আবার জন্মিতে চান? কাহার তুলনায় কবি তাঁহার গ্রামকে পছন্দ করিয়াছেন?

৮। দ্বিতীয় স্তবকটির গদ্যরূপ লেখ।

৯। গ্রামের লতা, ঘাসের ফুল, পথের ধারের গাছ, পথের ধূলি, সূর্য কিরণ কবির কাছে কিরূপ মনে হয়?

Theme

1. Praise for village

জীবনের হিসাব

—সুকুমার রায়

কবি-পরিচয়। সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) বাংলা কবিতা গল্প নাটক—সর্বক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া হাসির গল্প কবিতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি ছোটদের জন্য লিখিলেও, তাঁর সব রচনাই ছোটবড়ো সকলের কাছে উপভোগ্য। "হযবরল", "আবোল-তাবোল", "খাই খাই" তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

[**রচনা-পরিচয়।** গল্পমূলক এই কবিতায় হাস্যরসের মধ্য দিয়া কবি বলিয়াছেন যে উচ্চ জ্ঞান সকলের জন্য প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে—কিন্তু বাঁচিবার মত বিদ্যা সকলের থাকা চাই-ই।]

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে
মাঝিরে কন, "বলতে পারিস্ সূর্যি কেন ওঠে?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে? জোয়ার কেন আসে?"
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, "সারা জনম মরলিরে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।"



খানিক বাদে কহেন বাবু, "বল ত দেখি ভেবে
নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় হতে নেবে?

বল ত কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি?"
মাঝি যে কয়, "আরে মশাই অত কি আর জানি?"
বাবু বলেন, "এই বয়সে জানিসনেও তাকি?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো, অষ্ট আনাই ফাঁকি।"

আবার ভেবে কহেন বাবু, "বল্ ত ওরে বুড়ো,
কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চূড়ো?
বল্ ত দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন?"
বৃদ্ধ বলে, "আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন?"
বাবু বলেন, "বলব কি আর, বল্‌ব তোরে কি তা,—
দেখ্‌ছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।"

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকাখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, "এ কি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?"
মাঝি শুধায়, "সাঁতার জানো?" মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, "মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।"

অনুশীলনী

১। মাঝি কি কি বিদ্যা জানিত না। কোন্ বিষয়টি তাহার জানা ছিল?
২। কাহার জীবন "ষোল আনাই মিছে" হইল? কেন হইল?
৩। বাবু মশাইয়ের স্বভাবটি কেমন? মাঝির জীবনটা "বারো আনাই বৃথা" একথা তিনি কেন বলিয়াছিলেন?

৪। মাঝি কি কি বিদ্যা জানিত না। কোন্ বিষয়টি তাহার জানা ছিল?

৫। ফ্যালফেলিয়ে, বোট, পানি, খেলো, খানিক—শব্দগুলির মানে আর ব্যবহার লিখ।

৬। এই কবিতার গল্পটি পাঁচটি বাক্যে বল।

৭। শেষ স্তবকটি চলিত গদ্যে লেখ।

৮। "তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।" একথা কে কাহাকে কেন বলিয়াছিল? কিসের উত্তরে বলিয়াছিল?

৯। "দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা।" কে কখন কাহাকে একথা বলে? কথাটা কি ঠিক?

Theme

1. Theoretical Knowledge is incomplete knowledge
2. So called learned sometimes ~~[illegible]~~ are in trouble
3. They look down upon the experienced wise people because of their low status

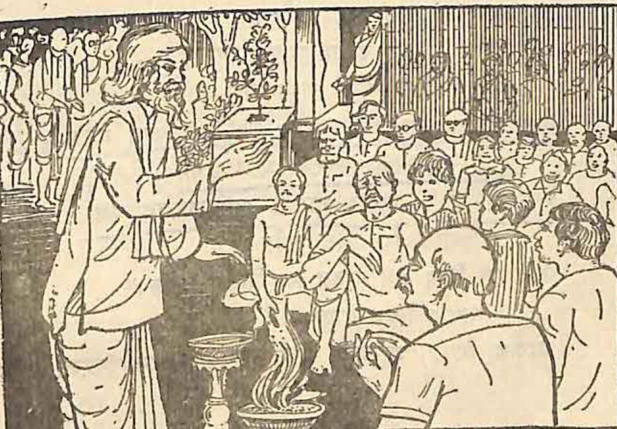
কথকতা

—সুনির্মল বসু

কবি-পরিচয়। ছোটদের অতি প্রিয় লেখক ছিলেন সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭)। কবিতা এবং গল্প, বিশেষ করিয়া হাস্যরসের লেখায় তিনি অনেকদিন ধরিয়া এ দেশের শিশুপাঠকদের প্রভূত আনন্দ দিয়াছেন।

[**রচনা-পরিচয়।** একটি হাসির কবিতা—কবিতার আকারে লেখা গল্প। কথকতা শুনিয়া বিধু কাঁদিয়া ফেলিল। সকলে ভাবিল সে বড় ভক্ত। কিন্তু আসলে কথকের দাড়িনাড়া দেখিয়া তাহার প্রিয় মৃত রামছাগলের কথা মনে পড়িয়াছিল।]

হচ্ছে কথকতা
কথক-ঠাকুর মধুর সুরে কচ্ছে কত কথা।
শ্রোতার দলে হেথায় হোথায় বসছে সারে সারে।
কথক-ঠাকুর ভাবের ঘোরে লম্বা-দাড়ি নাড়ছে বারে বারে।
চিকের আড়ে পাড়ার যত মেয়ের দলে জোটে,
ছেলে চেঁচায়, মেয়ে চেঁচায়,—বিষম হল্লা ওঠে।



সবাই বলে—"চুপ্ চুপ্ চুপ্—থামো—
ছেলেমেয়ের হল্লা কেন,—রামঃ!"
চিকের আড়ে ফিস্ ফিস্ ফিস্—আবার সবাই চুপ্।
কথক-ঠাকুর বলেন কথা,—আশে পাশে জ্বলছে ধুনো, ধূপ।

দর-দালানে ভদ্রলোকের ভীড়,
ভক্তিভরে নীচু সবার শির।

শুনতে কথকতা—
বিধু তাঁতি এসেছিল নাতির সাথে তথা।
হঠাৎ বিধু ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে,
চোখ্ দিয়ে তার দর দর জল ছোটে।
কথার শেষে জগা ঠাকুর বল্লে সেথায় দুলিয়ে তাহার টিকি,
"বিধু-তাঁতি ভক্ত মানুষ ঠিকই।"
বল্লে তখন পাড়ার নাপিত মাধু—
"অনেকদিনই জানতুম ভাই বিধু তাঁতি মস্ত বড় সাধু।"
বল্লে হেসে ছিলিম ফুঁকে ছিদাম মুচির কাকা—
"বৃন্দাবনে তীর্থে যাবে, জমাচ্ছে তাই টাকা
হুঁ হুঁ, আমি জানি।"
"বিধু সাধু বিধু মহৎ"—সবাই তখন করলো কানাকানি।

বল্লে তারে গদাধরের পিসে,
"হাঁরে বিধু, কান্না পেল কিসে?"
বিধু তাঁতি বল্লে তাড়াতাড়ি—
কথক-ঠাকুর নাড়্ছিল মুখ, নড়্ছিল তার দাড়ি—
তাই না দেখে জাগলো মনে ব্যথা,
পড়্লো মনে আমার সাধের রামছাগলের কথা।
ভুলতে কি আর পারি—
তার যে ছিল এম্নিতর এম্নিতর দাড়ি।"
মাথায় দিয়ে হাত—
আবার বিধু "হু-হু" করে ডুকরে কেঁদে উঠলো অকস্মাৎ।

অনুশীলনী

১। কথকতা কি?
২। কথক ঠাকুর কি ভাবে কথকতা করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দাও।

৩। বিধু তাঁতি কথকতা শুনিয়া কি করিল?

৪। বিধুর কান্না দেখিয়া জগা ঠাকুর, মাধু, ছিদামের কাকা কি কি মন্তব্য করিয়াছিল?

৫। বিধুর কান্নার কারণ কি?

৬। এই কবিতাটি পড়িয়া হাসি পায় কেন?

৭। কবিতাটির শেষ স্তবকটি চলিত গদ্যে লেখ।

৮। শব্দার্থ লেখ এবং বাক্য রচনা করঃ—হল্লা, চিক, ভক্ত, ছিলিম, তীর্থ, সাধু, মহৎ, ডুকরে।

৯। লিঙ্গান্তর করঃ—নাতি, মুচি, কাকা, পিসে।

১০। "বিধু-তাঁতি ভক্ত মানুষ ঠিকই।"—এ কথা কে বলে? কখন কেন বলে? একথা কি ঠিক?

১১। "ভুলতে কি আর পারি—
তার যে ছিল এমনিতর এমনিতর দাড়ি।"
এ কথা কে কখন কেন বলে? ইহাতে কাহার কাহার কি কি ধারণা ভুল প্রমাণিত হইল?

Theme

1. Humour
2. The kathak — a narrator singer may feel a serious defamation from the story of the poem

কুটীর

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কবি-পরিচয়। ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও কবি অচিন্ত্যকুমার শেষ দিকে রামকৃষ্ণের জীবনী রচনা করিয়া জনপ্রিয় হন। তিনি ছোটদের উপযোগী কবিতা, গল্প, ভ্রমণ-কাহিনীও অনেক লিখিয়াছেন।

[**রচনা-পরিচয়।** দুইটি ছোট গরিব গ্রামবাসী মেয়ের আনন্দ-উল্লাস এই কবিতায় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। পল্লীর শান্ত জীবনের চমৎকার ছবি।]

ঝিকিমিকি দেখা যায় সোনালী নদীর,
ওইখানে আমাদের পাতার কুটীর।
এলোমেলো হাওয়া বয়
সারা বেলা কথা কয়;
কাশফুলে দুলে ওঠে নদীর দু'পার,
রূপসীর শাড়ি যেন তৈরি রূপার।



কুটীরের কোল ঘেঁষে একটু উঠোন,
নেচে নেচে খেলা করি ছোট দু'টি বোন।

পরনে খড়্‌কে ডুরে,
বেণী নাচে ঘুরে ঘুরে,
পায়ে পায়ে রুণু ঝুনু হালকা খাড়ুর,
কেন নাচি নেই তার খেয়াল কারুর।

আকাশে গড়িয়া ওঠে মেঘের মিনার,
তারি ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের কিনার।
গাছের পাতার ফাঁকে
আকাশ যে চেয়ে থাকে;
গুণ গুণ গান গায় চোখে নাই ঘুম,
চাঁদ যেন আমাদের নিকট কুটুম।

দুই পা এগিয়ে এসে উঠোন-টুকুর।
তালবনে ঘেরা দেখ মোদের পুকুর।
ভরে আছে চারিভিতে
শাপ্‌লা ও কলমিতে;
জলটুকু টল্‌টল্ চাউনি খুকুর,
যেন গো মেঘের এক টুক্‌রো মুকুর।

Theme
1. Praise for village life

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ লেখঃ এলোমেলো, খড়্‌কে-ডুরে, খাড়ু, মিনার, মুকুর।

২। সরলার্থ লেখঃ (ক) কাশফুল দুলে...রূপার। (খ) চাঁদ যেন আমাদের নিকট কুটুম। (গ) জলটুকু টল্‌টল্‌...মুকুর।

৩। কাহারা এই কবিতাটি বলিতেছে? তাহাদের কোন্ কোন্ কাজের কথা এই কবিতায় আছে?

৪। এই কবিতায় কুটীরের যে বর্ণনা আছে তাহা তোমার নিজ ভাষায় লেখ।

৫। উহাদের পুকুরটি কোথায়? কেমন দেখিতে? সেখানে কি ফুল কি গাছ আছে? পুকুরের সহিত উহারা কাহার তুলনা করিয়াছে?

৬। কুটীরের উঠানে কাহারা খেলা করে? তাহাদের পোশাক ও সাজসজ্জা কেমন? তাহারা কেন নাচে?

৭। রাত্রিতে আকাশ কেমন দেখায়? চাঁদকে তাহাদের কি মনে হয়?

৮। এই কুটীরটি কোথায় কি দিয়া তৈরী? বাতাস কি করে? নদীর ধারের কাশফুলকে কি রকম মনে হয়?

দেখব এবার জগৎটাকে

—কাজী নজরুল ইসলাম

কবি-পরিচয়ঃ নজরুল ইসলাম বাংলার বিপ্লবী কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁর কবিতায় তিনি পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য বারবার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি তরুণদের মনের-প্রাণের-কাজের—সবদিকের স্বাধীনতার দরজা খুলিয়া দিতে বলেন তাঁর কবিতায়। শোষিত মজুর-কৃষকদের তিনি শুনাইয়াছিলেন সাম্যের বাণী। কবি নজরুল গান রচনায়ও বিশেষ দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পরেই এ দেশে নজরুল-গীতির জনপ্রিয়তা। কবি ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

[রচনা-পরিচয়। একটি দুঃসাহসী বালকের ঘর ছাড়িয়া গোটা পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিবার বিপজ্জনক সব অভিযানে যোগ দিবার বাসনা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।]

থাক্‌ব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে,
দেশ হ'তে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তা'রা কেমন ক'রে।
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে বীর লাখে লাখে,
কেমন ক'রে বীর ডুবুরি সিন্ধু ছেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপটে ধরে ঢেউ-এর ঝুঁটি যুদ্ধজাহাজ চলছে ছুটি—
কেমন ক'রে আনছে মাণিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে,
কেমন ক'রে টানলে সাগর উথলে ওঠে জোয়ার বানে।
কেমন ক'রে মথলে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চূড়ে,
তুহিন মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চড়ে, চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে—
শুন্‌ব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল হ'তে আসছে উড়ে!
রইব নাকো বদ্ধ খাঁচায় দেখব এ সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ, বাতাস, চন্দ্র-তারায়, সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশদিকেতে পড়ব লুটে,
পাতাল ফেড়ে নামব আমি উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্বজগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখ।

২। ছেলেটি কোথায় কোথায় কি ধরনের দুঃসাহসিক অভিযান করিতে চায়?

৩। কাহার লেখা কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত? প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যা করঃ—(ক) কেমন ক'রে মথলে...আসছে উড়ে!

(খ) আকাশ বাতাস...মুঠোয় পুরে।

৪। বালক সমুদ্রে কিরূপ অভিযান করিতে চায়?

৫। বালকের মহাকাশ অভিযানের কিরূপ ইচ্ছা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে?

৬। "কেমন করে মথলে পাথার...ফুঁড়ে।"—এই চরণে যে পৌরাণিক কাহিনীর ইঙ্গিত আছে তাহা খুব সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বল।

৭। "কিসের অভিযানে...হিমালয়ের চূড়ে।"—কেন মানুষ হিমালয়ের চূড়ায় পেঁৗছিবার অভিযান করে? এইরূপ একজন অভিযাত্রীর নাম কর।

৮। কবিতাটির প্রথম ছয়টি চরণের গদ্যরূপ লেখ।

৯।...শব্দার্থ লেখঃ—ডুবুরি, দুঃসাহসী, অচিনপুর, হাউই, সন্ধানী, বিশ্বজগৎ, অভিযান।

Theme

1. adventure
2. to know the unknown
3. aspiration of the child